ফেরান। তিনি মুখ ফিরানোর পর পুনরায় তাকাতেই দেখলেন একজন সুশ্রী যুবক দাঁড়ানো। বর্ণনাকারী তার সৌন্দর্য, পোশাকের জাঁকজমক ও সুগন্ধি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ হে মালাকুল মওত, যদি মুমিন কেবল তোমারই দীদার লাভ করে এবং অন্য কোন সওয়াব না পায়, তবু তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

দু'জন লেখক ফেরেশতাকে দেখাও এরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমরা এ খবর পেয়েছি যে, মৃতের সামনে দু'জন আমল লেখক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করে। মৃতব্যক্তি আনুগত্যশীল হলে তারা বলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অনেক. সৎ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ এবং অনেক সৎ কাজে হাযির করেছ। আর মৃতব্যক্তি গোনাহগার হলে তারা বলে ঃ আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান না করুন। অনেক মন্দ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ এবং অনেক মন্দ কাজে হাযির করেছ। মন্দ কথা শুনিয়েছ। এটা তখন হয়, যখন মৃতের দৃষ্টি তাদের উপর পতিত হয়।

তৃতীয় বিপদ হচ্ছে দোযখে গোনাহগারদের ঠিকানা দেখতে পাওয়া। তারা তা দেখার পূর্বেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, অন্তিম মুহূর্তে তাদের দৈহিক শক্তিগুলো শিথিল হয়ে যায় এবং আত্মা বের হওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা মালাকুল মওতের একটি বাক্য না শুনা পর্যন্ত বের হয় না। এক বাক্য গোনাহগারের জন্যে এই ঃ হে আল্লাহর দুশমন! দোযখের সুসংবাদ শুন। অপর বাক্য মুমিনের জন্যে এই ঃ হে আল্লাহর ওলী! বেহেশতের খবর শুন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— তোমাদের কেউ দুনিয়া থেকে কখনও বের হবে না, যে পর্যন্ত জান্নাতে অথবা দোযখে নিজের ঠিকানা ও বৈঠক না দেখে নেবে। এক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে ঃ

من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاءه كره الله لقاءه -

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমরা তো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন ঃ এটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের বিপদকে সহজ করে দেয়া হলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন।

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন বলেন— হে মালাকুল মওত! আমার অমুক বান্দার কাছে যাও এবং তার রূহকে আমার কাছে আন, যাতে তাকে সুখী করি। তার আমল দ্বারা আমি কেবল তাকে পরীক্ষা করছি। আমি যেমন চেয়েছিলাম, তাকে তেমনি পেয়েছি। অতঃপর মালাকুল মওত পাঁচশ' ফেরেশতা সমভিব্যাহারে সে বান্দার কাছে যায়। ফেরেশতাদের হাতে থাকে ফুলের ছড়ি, জাফরানের শাখা। প্রত্যেক ফেরেশতা তাকে নতুন সুসংবাদ শুনায়। তার রূহের জন্যে ফেরেশতারা দু'সারিতে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শয়তান তাদেরকে দেখে মাথায় হাত রেখে চিৎকার করে এবং রাগে দাঁত কটমট করতে থাকে। তার বাহিনী তাকে জিজ্ঞেস করে— তোমার কি হল? এমন করছ কেন? সে বলে— তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, এই বান্দা এত মর্তবা লাভ করল, তোমরা কোথায় ছিলে? তার খবর নাওনি কেন? বাহিনী বলে— আমরা অনেক হাত-পা মেরেছি; কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হযরত হাসান বলেন ঃ মু'মিনের সুখ আল্লাহ তা'আলার দীদারেই নিহিত। মৃত্যুর দিন তার জন্যে উল্লাস, খুশী ও ইযযতের দিন হয়ে থাকে।

জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ)-কে কেউ মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি চান? তিনি বললেন ঃ হাসান বসরীকে দেখতে চাই। হযরত হাসান বসরী তাঁর কাছে গেলে বলা হল ঃ হাসান বসরী উপস্থিত হয়েছেন। হযরত জাবের তাঁর দিকে চোখ তুলে বললেন ঃ নাও ভাই, এখন আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জান্নাত অথবা দোযখের দিকে চললাম।

মৃত্যুর সময় মানুষের উত্তম অবস্থা হচ্ছে স্থির থাকা, মুখে কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা থাকা। আকার-আকৃতি কিরূপ হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির জন্যে তিনটি বিষয় আশাব্যঞ্জক— কপালে ঘাম থাকা, চক্ষু অশ্রুসজল থাকা এবং ঠোঁট শুকনো থাকা। এগুলো আল্লাহ তা'আলার রহমতের লক্ষণ, যা তার উপর নাযিল হয়। কণ্ঠে নাক ডাকার শব্দ এবং

লোহিত বর্ণ ও ঠোঁট মেটে রঙের হওয়া আযাবের লক্ষণ। মুখ দিয়ে কালেমায়ে শাহাদত বের হওয়া কল্যাণের লক্ষণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لقنوا امواتكم لااله الاالله

অর্থাৎ, তোমরা মরণোন্মুখ ব্যক্তিদেরকে কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার উপদেশ দাও।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরপর আছে,

فانهاتهدم ماقبلها من الخطايا -

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা মরণোন্মুখদের কাছে যাও, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং কালেমা তাইয়েবার তালকীন কর। কেননা, তারা দেখে। যে কালেমার তালকীন করবে, তার উচিত পীড়াপীড়ি না করা; বরং নম্রতা সহকারে বলা। কেননা, রোগীর জিহ্বা কোন সময় বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন তার কাছে পীড়াপীড়ি অসহনীয় মনে হয়। ফলে, কালেমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে খাতেমা অশুভ হওয়ার আশংকা থাকে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা রাখার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াছেলা ইবনে আসকা কোন এক রোগীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ কর? সে বলল ঃ আমার গোনাহ আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমি আমার পালনকর্তার রহমত আশা করি। একথা শুনে ওয়াছেলা "আল্লাহু আকবার" বললেন। তার সাথে উপস্থিত সবাই "আল্লাহু আকবার" বলল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে একটি হাদীসে কুদসী শুনেছি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটবর্তী থাকি। সে যা ইচ্ছা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করুক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক যুবকের কাছে মরণাপন্ন অবস্থায় গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নিজেকে কেমন মনে কর? সে আরয করল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী এবং নিজের গোনাহের জন্যে ভীতু। তিনি বললেন ঃ এই অবস্থায় এ দু'টি বিষয় যার অন্তরে একত্রিত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা-ই দেন— যা সে আশা করে। তাকে ভয় থেকে নিরাপদ রাখেন।

মৃত্যুর সময় বান্দার সামনে তার আমলের সৌন্দর্য আলোচনা করা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মতে মুস্তাহাব, যাতে সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা করে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যখন কোন প্রাণ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং কোন প্রাণ পশ্চিম প্রান্তে থাকে অথবা কোন জায়গায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় অথবা দুই বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তুমি কি কর? মালাকুল মওত বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশে আত্মাসমূহকে ডাক দেই। তারা আমার এই দু'অঙ্গুলির মধ্যে এসে যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ পৃথিবী মালাকুল মওতের সামনে বড় থালার মত বিস্তৃত থাকে। সে তা থেকে যাকে ইচ্ছা নিয়ে নেয়।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ এক বাদশাহ কোথাও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সে প্রথমে পোশাক আনতে বলল। পোশাক ভাল মনে হল না। অন্য পোশাক আনতে বলল। এভাবে সে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র জোড়াটি পরিধান করল। এমনিভাবে সে সওয়ারীসমূহের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম ছিল, সেটিতে আরোহণ করল। এরপর শয়তান এসে তার নাকের ছিদ্র পথে ফুঁ মেরে তাকে গর্ব ও অহংকারে পূর্ণ করে দিল। বাদশাহ লশকর সমভিব্যাহারে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হল। গর্ব ও অহংকারের আতিশয্যে কারও প্রতি তার দৃষ্টি পড়ত না। ইতিমধ্যে তার কাছে সেকেলে গোছের এক ব্যক্তি এসে সালাম করল। বাদশাহ সালামের জওয়াব দিল না। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল। বাদশাহ বলল ঃ লাগাম ছেড়ে দে। তুই চরম ধৃষ্টতা করেছিস। লোকটি বলল ঃ তোমার সাথে আমার কাজ আছে। বাদশাহ বলল ঃ আচ্ছা, বল কি বলবি। লোকটি বলল ঃ গোপন কথা বলব ঃ বাদশাহ মাথা নত করলে সে তার কানে আস্তে বলল ঃ আমি মালাকুল মওত। বাদশাহের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে কম্পিত স্বরে বলল ঃ আমাকে সময় দাও, যাতে আমি ঘরে ফিরে প্রয়োজন সেরে নিতে পারি এবং পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে পারি। সে বলল ঃ এখন সময় নেই। আপন ঘর

ও পরিবার-পরিজনকে দেখা তোমার আর ভাগ্য হবে না। এরপর মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল। সে কাঠের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেল।

এরপর মালাকুল মওত সামনে এগিয়ে গিয়ে এক ঈমানদারের সাথে মিলিত হল। তাকে সালাম করলে সে সালামের জওয়াব দিল। মালাকুল মওত বলল ঃ আমাকে তোমার কানে কানে কিছু কথা বলতে হবে। সে বলল ঃ খুব ভাল। সে আস্তে কানে বলে দিল। আমি মালাকুল মওত। মুমিন বলল ঃ চমৎকার। আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আমি ততটুকু আগ্রহান্বিত, যতটুকু আপনার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আগ্রহান্বিত। মালাকুল মওত বলল ঃ যে প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বের হয়েছ, তা পূর্ণ করে নাও। সে বলল, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের চেয়ে বেশী আমার অন্য কোন প্রিয় কাজ নেই। মালাকুল মওত বলল ঃ রূহ কবয করার জন্যে তুমি নিজের কোন অবস্থা পছন্দ করে নাও। সে বলল ঃ আমাকে উযু করে নামায পড়ার সময় দিন। যখন আমি সেজদায় থাকি, তখন আমার রূহ কবয করবেন। মালাকুল মওত তাই করল।

আবু বকর আব্দুল্লাহ মুযনী (রহঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি অগাধ ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে তার পুত্রদেরকে বলল ঃ তোমরা আমাকে আমার সব রকম ধন-সম্পদ দেখাও। সেমতে তার সামনে ঘোড়া, উট, গোলাম, বাঁদী ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী উপস্থিত করা হল। সে এ সমস্ত ধন-সম্পদ দেখে পরিতাপ ও ক্রন্দন করল। মালাকুল মওত তাকে ক্রন্দন করতে দেখে বলল ঃ কাঁদছ কেন? সেই সত্তার কসম, যিনি তোমাকে এই ধনরাশি দান করেছেন, তোমার দেহ থেকে তোমার আত্মা বিচ্ছিন্ন না করে আমি এ ঘর থেকে বের হব না। সে বলল ঃ আমাকে এ ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মত সময় দাও। মালাকুল মওত বলল ঃ তা হবে না। এখন আর সময় দেয়া হবে না। এর আগে দান করলে না কেন? একথা বলে মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল।

আমাশ খায়ছামা (রহঃ) রেওয়ায়েত করেন— মালাকুল মওত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর জনৈক সভাসদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বাইরে চলে আসার পর সভাসদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ সে মালাকুল

মওত। সভাসদ বলল ঃ সে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে আমার প্রাণ কেড়ে নেবে। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন ঃ এখন তোমার ইচ্ছা কি বল। সে বলল ঃ আমি চাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং বায়ুকে আদেশ করুন, যেন সে আমাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। সোলায়মান (আঃ) বায়ুকে আদেশ করলেন। বায়ু তাই করল। কিছুদিন পর মালাকুল মওত পুনরায় দরবারে আগমন করলে সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুমি আমার অমুক মুসাহিবের প্রতি বারবার তাকিয়েছিলে। এর কারণ কি? মালাকুল মওত বলল ঃ হ্যাঁ, আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছিল, আমি অমুক সময়ে পৃথিবীর অমুক প্রান্তে তার রূহ কবয করব। এমতাবস্থায় তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানেই পেয়েছি।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই ছিলেন বুযুর্গতম ব্যক্তি। মহত্ত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কেননা, তিনিই ছিলেন একাধারে তাঁর খলীল, হাবীব, মনোনীত রসূল, নবী ও পয়গম্বর। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর জীবনকাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ওফাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না; বরং অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে মনোনীত ফেরেশতাগণকে পাঠালেন, যারা অত্যন্ত দ্রুততা সহকারে তাঁর পবিত্র আত্মাকে পবিত্র দেহপিঞ্জর থেকে অপসারিত করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দিলেন। এরপরও রূহ কবয করার সময় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। মুখ দিয়ে "আহ" নির্গত হয়। উপর্যুপরি অস্থিরতা দেখা দেয়। রঙ বদলে যায় এবং কপাল ঘর্মাক্ত হয়। তাঁর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই মর্মবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নবুওয়তের পদমর্যাদা এখানে তাকদীরকে টলাতে পারেনি এবং তাঁর পরিবারের ব্যথা ও বেদনার প্রতি লক্ষ্য করেনি। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে "মকামে মাহমুদ" ও হাউযে কাওছারের অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন এবং তিনিই কিয়ামতের মাঠে অপরাধীদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে মুখ খুলবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, আমরা সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন ও হাবীবে রাব্বিল আলামীনের ওফাতদশা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করি না এবং যে অবস্থা আমাদের হবে, তা বিশ্বাস করি না; বরং আমরা

কামনা-বাসনা ও পাপাচারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকি। সম্ভবত আমরা মনে করি, আমরা চিরকাল এখানে থাকব অথবা কুকর্ম সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা বড়। কিন্তু তা সত্য নয়। আমরা বরং নিশ্চিতরূপে জানি, সবাই দোযখে নিপতিত হব। তবে যারা পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণ, তারাই কেবল দোযখ থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي

الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا -

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই দোযখ অতিক্রম করবে। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালমেদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

অতএব, প্রত্যেকের উচিত নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা, সে যালেমদের নিকটবর্তী, না পরহেযগারদের নিকটবর্তী?

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের জীবন চরিতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা সদা সর্বদা ভীত থাকতেন। রসূলে করীম (সাঃ)ও নিজের ওফাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় কি কষ্টই না তিনি পেয়েছেন! হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ঘরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলাম। তিনি অশ্রুসজল নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা এসেছ? খুব ভাল হয়েছে! আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখুন, আশ্রয় দিন এবং সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়ত করছি। তোমরা আমার পক্ষ থেকে নিজেকে এবং তোমাদের পরে যারা এই দ্বীনে দাখিল হবে, তাদেরকে সালাম বলো।

বর্ণিত আছে, ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার পর আমার উম্মতের কাণ্ডারী কে হবে? আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের কাছে ওহী পাঠালেন— আমার হাবীবকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, উম্মতের ব্যাপারে আমি তাকে লাঞ্ছিত করব না। যারা কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমার হাবীব হবে প্রথম। সবাই সমবেত

হলে সে-ই হবে তাদের নেতা। তাঁর উম্মত জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য উম্মতের জান্নাতে যাওয়া হারাম হবে। এই সুসংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এবার আমার চোখ জুড়িয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ সাতটি কূপ থেকে সাত মশক পানি আনিয়ে আমাকে গোসল করাও। আমরা তাই করলাম। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। এরপর তিনি নামায পড়লেন, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন এবং আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করলেন হে মুহাজিরগণ! তোমরা সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছ। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা আর বাড়বে না। তারা আমার বিশেষ আপন। আমি তাদের মধ্যে এসে জায়গা নিয়েছি। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের সম্মান করো আর কুকর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করো। এরপর বললেন ঃ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটস্থ বস্তুর মধ্য থেকে যেকোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর নিকটস্থ বস্তুকেই পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) কাঁদলেন এবং বুঝে নিলেন যে, তিনি নিজের অবস্থাই বর্ণনা করছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শান্ত করার জন্যে বললেন ঃ আবুবকর! শক্ত হও, ঘাবড়িয়ো না। যে সব দরজা মসজিদের দিকে খুলে, সেগুলো সব বন্ধ করে দিয়ো; কিন্তু আবুবকরের দরজা বন্ধ করো না। আমি আবুবকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাউকে জানি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র রূহ আমারই ঘরে আমারই পালার দিনে এবং আমারই কোলে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে ঊর্ধ্বজগতের দিকে উড্ডয়ন করে। ওফাতের সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত করে দেন। আমার ভাই আবদুর রহমান তখন একটি মেসওয়াক হাতে নিয়ে আমার কাছে হাযির হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মেসওয়াকটির দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম, এটি তার খুব ভাল লাগছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম ঃ মেসওয়াকটি আপনাকে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করলে আমি সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি মুখে দিতেই তিক্ততা অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ নরম করে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় বললেন ঃ হ্যাঁ। সেমতে আমি সেটি চিবিয়ে নরম করে

দিলাম। এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একটি পেয়ালায় পানি রাখা ছিল। তিনি পানিতে হাত রাখতেন এবং বলতেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'— মৃত্যু বড় কঠিন। অতঃপর তিনি হাত উপরে তুলে বললেন ঃ রফীকে আ'লা, রফীকে আ'লা। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, এখন তিনি আমাদেরকে অপছন্দ করবেন।

সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন— আনসাররা যখন দেখল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে, তখন তারা মসজিদে নববীর আশেপাশে জমায়েত হল। হযরত আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং আরয করলেন ঃ লোকজন সমবেত হয়েছে। তারা ভয় করছে! এরপর হযরত ফযল গেলেন এবং একই কথা বললেন। হযরত আলীও সেখানে পৌছে একই কথা আরয করলেন। তিনি বাহু প্রসারিত করে বললেন ঃ ধর আমার হাত। তাঁরা হাত ধরলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি বলাবলি করছে? তাঁরা আরয করলেন ঃ লোকেরা আপনার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে। পুরুষরা আপনার কাছে জমায়েত হয়েছে দেখে মহিলারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। রসূলে করীম (সাঃ) উঠলেন এবং হযরত আলী ও হযরত ফযলের সাহায্যে বাইরে এলেন। হযরত আব্বাস আগে আগে ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে পা ফেলছিলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরের নীচের সোপানে বসে গেলেন। জনতা তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও প্রশংসার পর এরশাদ করলেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমি শুনেছি তোমরা আমার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ। মনে হয় তোমরা মৃত্যুকে ঘৃণা করছ। আমি কি এর আগে আমার মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদেরকে খবর দেইনি? আমার পূর্বে যে সকল পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের কেউ মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেছেন কি? না তোমাদের মধ্যে কেউ অমর হয়েছে? শুন, আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হব। তোমরাও তাঁর সাথে মিলিত হবে। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, যারা পূর্বে হিজরত করে এখানে এসেছে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আমি মুহাজিরদেরকে পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রেখে চলার ওসিয়ত করছি। কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থাৎ, মহাকালের কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পরস্পরকে সত্য ও সবরের উপদেশ প্রদান করে।

সকল কাজই আল্লাহর আদেশে হয়। কাজেই কোন ব্যাপারে বিলম্বের কারণে তোমরা তাতে জায়েয হওয়ার আবেদন করো না। কেননা, কারও তাড়াহুড়ার কারণে আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যে আল্লাহর উপর প্রবল হতে চাইবে, আল্লাহ তাকে পরাভূত করবেন। তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ -

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আনসারদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সদাচরণের ওসিয়ত করছি। কারণ, তারা তোমাদের পূর্বে মদীনায় বসবাস ও খাঁটি ঈমান অর্জন করেছে। তারা নিজেদের অর্ধেক ফসল তোমাদেরকে দান করেছে। নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মনে রেখ, যদি তোমাদের কেউ দু'ব্যক্তির উপরও শাসনক্ষমতা লাভ করে, তবে তাদের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি যা দেয়, তা যেন সে কবুল করে এবং কেউ অন্যায় করলে তাকে যেন মার্জনা করে। তাদের উপর নিজেকে যেন অগ্রাধিকার না দেয়। জেনে রেখ, তোমাদের সাক্ষী আমি। তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। সাবধান! তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হাউযে কাওছার। আমার এই হাউয সিরিয়া, বসরা ও ইয়ামনের চেয়েও প্রশস্ত। এর একটি প্রণালীর পানি দুধের চেয়েও সাদা, ফেনার চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। কেউ একবার এই পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হবে না। এর কংকর মোতি ও মৃত্তিকা মেশ্‌ক। কিয়ামতে কেউ এ থেকে বঞ্চিত

থাকলে সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। শুন, যে ব্যক্তি কাল আমার কাছে এই হাউযে মিলিত হতে চায়, সে যেন নিজের জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখে এবং এগুলোকে যোগ্য কাজেই ব্যবহার করে। এরপর হযরত আব্বাস আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কোরায়শদের সম্পর্কে মুসলমানদের কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কোরায়শকে খেলাফতের ওসিয়ত করছি। মানুষ কোরায়শদের অনুগামী। সৎব্যক্তি তাদের সৎব্যক্তির অনুগামী এবং অসৎ লোক তাদের অসৎ লোকের অনুগামী। সুতরাং হে কোরায়শগণ! মানুষকে কল্যাণের কথা বলতে থাকবে। গোনাহ নেয়ামতকে পাল্টে দেয় এবং চরিত্রকে ধ্বংস করে। যখন জনগণ সৎকর্ম করবে, তখন তাদের শাসকও সৎকর্ম করবে। আর জনগণ কুকর্মী হলে তাদের শাসকও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, এমনিভাবে মানুষের কৃতকর্মের কারণে আমি কতক জালেমকে কতকের শাসক করে দেই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ কিছু জিজ্ঞেস করে নাও। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মৃত্যু কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, নিকটবর্তী। হযরত আবুবকর বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর নিকটস্থ বস্তু আপনার জন্যে মোবারক হোক।

আমরা যদি জানতাম আপনি কোথায় যাবেন! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর দিকে, সিদরাতুল মুনতাহার দিকে, এরপর জান্নাতে মাওয়া, জান্নাতে ফেরদাউসে আ'লা, রফীকে আ'লা, চিরন্তন জীবন ও সুমধুর আয়েশের দিকে। হযরত আবু বকর আরয করলেন ঃ আপনাকে গোসল কে দেবে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারের নিকটতম পুরুষ, এরপর যে একটু দূরের। প্রশ্ন করা হল ঃ আপনার কাফন কি হবে? তিনি বললেন ঃ আমার এসব কাপড় দিয়েই কাফন দেবে— ইয়ামনী জোড়া এবং মিসরীয় চাদর। আপনার জানাযার নামায আমরা কিভাবে পড়ব— এ প্রশ্নটি করেই হযরত আবু বকর কাঁদতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও কেঁদে বললেন ঃ ব্যস কর। আল্লাহ তোমাদের মাগফেরাত করুন এবং তোমাদের নবীর বিনিময়ে তোমাদেরকে উত্তম

প্রতিদান দিন। তোমরা যখন আমাকে কাফন পরিয়ে দেবে, তখন খাট আমার এ কক্ষেই আমার কবরের পার্শ্বে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা বাইরে চলে যেয়ো। সর্বপ্রথম যিনি আমার উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করবেন, তিনি হবেন, আমার পরওয়ারদেগার। তিনি এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আমার উপর নামায পড়ার অনুমতি দেবেন। সেমতে প্রথমে জিবরাঈল এসে নামায পড়বেন, এরপর মীকাঈল, এরপর ইসরাফীল, এরপর মালাকুল মওত, এরপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতা নামায পড়বে।

এরপর তোমরা ভিতরে এসে আমার জানাযা পড়বে। এক এক দল আলাদা আলাদা এসে নামায পড়বে। আমার প্রশংসা করে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। চিৎকার করো না এবং সজোরে কান্নাকাটি করো না। প্রথমে ইমাম নামায শুরু করবে আমার পরিবারের নিকটতম লোকজনকে নিয়ে। তাদের পর যারা কিছু দূরের। পুরুষদের নামাযের পর মহিলারা, এরপর কিশোরদের দল আসবে। হযরত আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন ঃ কবরে কে নামবে? উত্তর হল ঃ আমার পরিবারের কয়েকজন নিকটতম লোক অনেক ফেরেশতাদের সাথে নামবে, যাদেরকে তোমরা দেখবে না; কিন্তু তারা তোমাদেরকে দেখবে। এখন আমার কাছ থেকে প্রস্থান কর এবং আমার পরবর্তী লোকদের ধর্মের কথাবার্তা শুনাও।

আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ বলেন ঃ অসুস্থতার সময় হযরত বেলাল একদিন নামায পড়ানোর জন্যে বললে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবুবকরকে নামায পড়াতে বল। হযরত আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি বাইরে এসে দরজার সামনে হযরত ওমর (রাঃ)-কে কয়েকজন লোকসহ দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে হযরত আবুবকর ছিলেন না। আমি হযরত ওমরকে বললাম ঃ আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ান। তিনি মসজিদে গমন করে নামাযের জন্যে "আল্লাহু আকবার" বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার 'আল্লাহু আকবার' বলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন ঃ আবুবকর কোথায়? ওমরের ইমামতি আল্লাহ তা'আলা মানবেন না এবং মুসলমানরাও স্বীকার করবে না। এ বাক্যটি তিনবার বলার পর তিনি বললেন ঃ আবুবকরকে বল নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আবুবকর একজন কোমলহৃদয় মানুষ। আপনার জায়গায় দণ্ডায়মান হলে তিনি কান্না সংবরণ করতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গিনী। আবুবকরকেই নামায পড়াতে বল। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন ঃ হযরত ওমরের নামায পড়ানোর পর হযরত আবুবকর নামায পড়ালেন। এরপর হযরত ওমর আমাকে বললেন ঃ হে রবীয়া তনয়! তুমি একি করলে? যদি আমার ধারণা না হত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে আমার কথা বলে থাকবেন, তবে আমি কেবল তোমার কথায় নামায পড়াতাম না। আমি বললাম ঃ তখন ইমামতির জন্যে আপনার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি।

হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমি হযরত আবুবকরের পক্ষ থেকে যে ওযর পেশ করেছিলাম, তার কারণ এই ছিল যে, তিনি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া খেলাফতে অনেক বিপদাশংকাও রয়েছে। তবে আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তার কথা ভিন্ন। আর এ আশংকাও ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই কেউ তাঁর জায়গায় নামায পড়াবে— তা হয়তো মুসলিম জনগণ পছন্দ করবে না। হযরত আবুবকর নামায পড়ালে মানুষ তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং তাকে অলক্ষুণে বলবে। কিন্তু তাই হয়, যা আল্লাহ চান। আল্লাহ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে হেফাযতে রেখেছেন এবং আমি যেসব বিষয়ের আশংকা করছিলাম, সেগুলো থেকে পরিষ্কার বাঁচিয়ে রেখেছেন। হযরত আয়েশা আরও বলেন ঃ ওফাতের দিন সকালে সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনেকটা সুস্থ দেখতে পান। এজন্যে সকলেই নিজ নিজ বাড়ি চলে গেলেন এবং খুশী খুশী কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে কেবল মহিলারা রয়ে গেল। আমি তাঁর পবিত্র মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইলাম। সেদিন আমাদের যে আশা ও আনন্দ ছিল, তা এর আগে কোন দিন ছিল না। ইতিমধ্যে তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমার কাছ থেকে বাইরে চলে যাও। এই ফেরেশতা আমার কাছে আসার অনুমতি চায়। মহিলারা বাইরে চলে গেল। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে বসলেন, তখন আমিও ঘরের এক কোণে চলে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ ধরে ফেরেশতার সাথে কানাকানি করলেন। এরপর আমাকে ডেকে নিজের মস্তক পুনরায় আমার কোলে তুলে দিলেন। মহিলাদেরকেও ভেতরে চলে আসতে বললেন। আমি আরয করলাম ঃ এই মৃদু আওয়াজ তো জিবরাঈলের ছিল না? তিনি বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ, হে আয়েশা! সে মালাকুল মওত। আমার কাছে এসে বলেছে— আল্লাহ তা'আলা আমাকে

পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বিনানুমতিতে আপনার কাছে না আসি। আপনি অনুমতি না দিলে আমি চলে যাব। অনুমতি দিলে ভেতরে আসব। আল্লাহ আরও নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনার কথা ছাড়া আপনার রূহ কবয না করি। এখন আপনি কি বল্লেন? আমি তাকে বলে দিয়েছি, জিবরাঈল না আসা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। জিবরাঈলের আসার সময় হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ তিনি বিষয়টি এমনভাবে পেশ করলেন আমাদের কাছে— যার কোন জওয়াব ছিল না। তাই আমরা চুপ করে রইলাম। এমন সময় মনে হল আমরা এক ভয়ংকর শব্দে হতবাক হয়ে গেছি। তাঁকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। বিষয়টির ভয়ঙ্করতা ও আতংকের কারণে আমাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মন-মস্তিষ্ক ভীতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিবরাঈল এসে সালাম করলেন। আমি তার মৃদু আওয়াজ চিনতে পারলাম। ঘরের সবাই বের হয়ে গেল। তিনি ভেতরে এলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বলে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি নিজেকে কেমন অনুভব করছেন? তিনি আপনার অবস্থা আপনার চেয়ে বেশী জানেন; কিন্তু তিনি আপনার মান-সম্মান ও গৌরবকে মানুষের উপর পূর্ণাঙ্গ করতে চান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি নিজেকে বেদনাক্লিষ্ট অনুভব করছি। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে যে মর্তবা তৈরী করে রেখেছেন, তাতে আপনাকে পৌছিয়ে দিতে চান। তিনি এরশাদ করলেন ঃ হে জিবরাঈল, মালাকুল মওত আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। জিবরাঈল আরয করলেন ঃ হে মুহাম্মদ, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্যে ব্যাকুল। তিনি আপনার সাথে যা করতে চান, তা তো আমি বলেই দিয়েছি। আল্লাহর কসম, মালাকুল মওত আজ পর্যন্ত কারও কাছে অনুমতি চায়নি এবং ভবিষ্যতেও কারও কাছে অনুমতি চাইবে না। কিন্তু আপনার গৌরবকে পূর্ণতা দান করা আল্লাহ তা'আলার লক্ষ্য এবং তিনি আপনার জন্যে অতিশয় আগ্রহী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন তুমি তার আগমন পর্যন্ত এখান থেকে যাবে না। এরপর রসূলে করীম (সাঃ) মহিলাদেরকে ভেতরে ডেকে নিলেন। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমার কাছে এস। তিনি তাঁর মাথার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। যখন হযরত ফাতেমা মাথা তুললেন,

তখন তাঁর চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তোমার মাথা আমার কাছে আন। তিনি পিতার মুখের কাছে কান লাগালেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কানে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতেমার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। পরবর্তীকালে আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমবার তিনি আমাকে বললেন ঃ তিনি আজই পরলোকগমন করবেন। এতে আমি কান্না রোধ করতে পারিনি। দ্বিতীয়বার তিনি বললেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছেন যাতে তাঁর পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে তাঁর সাথে মিলিত করেন এবং তাঁর সাথে রাখেন। তাই আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনি। এরপর হযরত ফাতেমা নিজের পুত্রদ্বয়কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনলেন। তিনি উভয়কে আদর করলেন। অতঃপর মালাকুল মওত এসে সালাম করল এবং অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ আমাকে আমার প্রভুর কাছে এক্ষুণি পৌছে দাও। মালাকুল মওত আরয করল ঃ আজই পৌছে দেব। আপনার প্রভু আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। অন্য কারও জন্যে তাঁর এতটুকু ব্যাকুলতা নেই। তিনি আমাকে কেবল আপনার বেলায় বিনা অনুমতিতে ভেতরে যেতে নিষেধ করেছেন— অন্য কারও বেলায় এমনটা হয়নি। কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট সময় একটু পরেই— একথা বলে মালাকুল মওত প্রস্থান করল এবং জিবরাঈল এসে আরয করল— আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা আমার পৃথিবীতে সর্বশেষ অবতরণ। এরপর কখনও অবতরণ করব না। ওহীও সমাপ্ত হল। আপনার কাছে উপস্থিতি ছাড়া পৃথিবীতে আমার কোন কাজ ছিল না। এখন আমি আমার স্থানেই থাকব।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ আল্লাহর কসম, ঘরের কারও কোন শব্দ করার সাধ্য ছিল না এবং কেউ পুরুষদেরকেও ডাকছিল না। জিবরাঈলের কথাবার্তা আমাদের সবাইকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল। এরপর আমি উঠে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মস্তক কোলে তুলে নিয়ে তাঁর বুকে হাত রেখে দিলাম। তাঁর সংজ্ঞাহীনতা শুরু হল। তাঁর কপাল থেকে এত ঘাম বের হচ্ছিল, যা আমি কোন মানুষের মধ্যে কখনও দেখিনি। আমি অঙ্গুলি দিয়ে ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি আমার জানা ছিল না।

যখনই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসত, আমি বলতাম— আপনার প্রতি আমার পিতামাতা ও বাড়ীঘর সবকিছু কুরবান হোক, আপনার কপালে এত ঘাম দিচ্ছে কেন? তিনি বললেন ঃ আয়েশা! মুমিনের প্রাণ ঘামের সাথে বের হয়, আর কাফেরের প্রাণ গাধার ন্যায় পথে নির্গত হয়। তখন আমরা ভয় পেলাম এবং নিজ নিজ ঘরে লোক পাঠালাম। সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তি আমাদের কাছে এল, সে ছিল আমার ভাই। তাকে আমার পিতা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জীবিত পায়নি। এর আগেই তিনি উর্ধ্বজগতে তাশরীফ নিয়ে যান। মোটকথা, কোন পুরুষ লোকের আগমনের পূর্বেই তিনি বিদায় নেন। আল্লাহ তা'আলাই সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর কাছে আসতে দেননি। কারণ, তাঁর ব্যাপারটি ছিল জিবরাঈল ও মীকাঈলের কাছে ন্যস্ত। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি একটি কথাই বলতেন— بل رفيق الاعلى এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁকে কয়েকবার এক্তিয়ার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যই বেছে নিয়েছেন। যখনই তাঁর কথা বলার শক্তি হত, তখনই বলতেন— নামায, নামায, তোমরা যতদিন জামাআতে নামায পড়বে, ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত সোমবার দিন চাশত ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছে। ফাতেমা বলেন ঃ সোমবার দিন আমার জন্যে শুভ নয়। এদিনে উম্মতের উপর বড় বড় বিপদ আসবে। কুফায় হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হলে উম্মে কুলছুমও তাই বললেন যে, এদিনটি তাঁর জন্য শুভ নয়। কেননা, এদিনেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও ওফাত পেয়েছেন, এদিনেই তাঁর স্বামী হযরত ওমর (রাঃ) শহীদ হন এবং এদিনেই তাঁর পিতা হযরত আলী শহীদ হন।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ফেরেশতারা মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দেয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর মৃত্যু অস্বীকার করলেন। কেউ কেউ বোবা হয়ে গেলেন— অনেকদিন পর্যন্ত কথা বললেন না এবং অনেকে পাগল হয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাদের মধ্যে ছিলেন, যারা মৃত্যু অস্বীকার করেছিল। তিনি বাইরে এসে বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পাননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে

ফিরিয়ে দেবেন এবং মুনাফিকদের হাত-পা কেটে দেবেন, যারা তাঁর মৃত্যু কামনা করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে যেমন চল্লিশ দিনের ওয়াদা করে নিয়ে যান, তেমনি আমাদের হুযুরকেও নিয়ে গেছেন। তিনি তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের কথা বলো না। তিনি ওফাত পাননি। আল্লাহর কসম, এখন থেকে যদি কাউকে একথা বলতে শুনি, তবে এই তরবারি দিয়ে তাকে আমি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব। হযরত আলী হতভম্ব হয়ে ঘরের ভেতরেই বসে রইলেন। হযরত ওসমান বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে হাতে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় যেন তিনি পথঘাটও ভুলে গিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যে অবস্থা হযরত আবুবকর ও আব্বাসের ছিল, তা আর কারও ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এ দু'জনকে তাওফীক ও দৃঢ়তা দান করেছিলেন। একা হযরত আবুবকরের সান্ত্বনাবাণীর কারণেই সবাই শান্ত ছিল। তবু হযরত আব্বাস বাইরে এসে বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, রসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি তো জীবদ্দশায় তোমাদের মধ্যে এ আয়াত পাঠ করতেন—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পালনকর্তার সামনে বাদানুবাদ করবে।

হযরত আবুবকর বনী হারেছের কাছে অবস্থান করছিলেন। ওফাতের সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর দীদারে ধন্য হলেন। এরপর মৃতদেহের উপর ঝুঁকে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ আমার পিতা ও মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'বার মৃত্যু দেবেন না। একবারই ওফাত ছিল, যা আপনি পেয়েছেন। অতঃপর তিনি জনতার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে

মুসলমানগণ! যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূজা করত, তারা জেনে নিক তিনি ওফাত পেয়েছেন। আর যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পালনকর্তার পূজা করত, তাদের জানা উচিত তিনিই চিরঞ্জীব— কখনও মরবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا -

অর্থাৎ, মুহাম্মদ তো একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পেছন ফিরে যাবে কি? যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না।

শ্রোতাদের এমন অবস্থা হল যেন তারা এই প্রথমবার আয়াতখানি শ্রবণ করল।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) খবর পেয়ে দুরূদ পাঠ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কথায় ও কাজে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। এসেই মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করে কপালে, কপোলে চুম্বন করলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন— আমি, আমার পিতা-মাতা ও সবকিছু আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি জীবিত অবস্থায়ও চমৎকার ছিলেন এবং মরেও চমৎকার। আপনার ইন্তেকালে সে ধারা খতম হয়ে গেল, যা অন্য কোন নবীর ইন্তেকালে খতম হয়নি। তাহলো ওহীর ধারা। অতএব, আপনার মর্যাদা বর্ণনার চেয়েও বেশী এবং কান্নারও উর্ধ্বে। আপনার রেসালত সর্বজনীন। যদি আপনার ইন্তেকাল আপনার ইচ্ছায় না হত, তবে আপনাকে হারানোর দুঃখে আমরা জীবন উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা চোখের পানি নিঃশেষ করে দিতাম।

কিন্তু যে বিষয়টি আপনি আমাদের থেকে দূর করতে পারেন না, তা

হচ্ছে বিষাদ ও স্মৃতি। ইলাহী! আমাদের পক্ষ থেকে এটি তোমার হাবীবকে পৌঁছে দাও।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— যখন আবুবকর কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন ঘরময় কান্নার রোল পড়ে গেল, যা বাইরের লোকেরাও শুনতে পেল। তিনি যখন কিছু বলতেন, তখন রোল আরও বেড়ে যেত। এমতাবস্থায় জনৈক দীর্ঘদেহী সবল ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ গৃহবাসীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এরপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

বেঁচে থাকায় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন; অর্থাৎ যে চলে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বিদ্যমান থাকেন। তাঁর কাছেই আশা রাখুন এবং তাঁর উপরই ভরসা করুন। ঘরের লোকেরা আওয়াজ শুনল; কিন্তু কার আওয়াজ, তা বুঝতে পারল না। কান্না থেমে গেল। সাথে সাথে সে আওয়াজও থেমে গেল। একজন বাইরে এসে দেখল সেখানে কেউ নেই। সে ভেতরে চলে গেল এবং পুনরায় ক্রন্দন রোল উত্থিত হল। আরও একজন এসে আওয়াজ দিল এবং তাকেও কেউ চিনল না। সে বলল ঃ হে নবী পরিবার! আল্লাহকে স্মরণ করুন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর শুকরিয়া করুন। তিনিই প্রত্যেক বিপদে সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক প্রিয়জনের বিনিময়। অতএব, তাঁরই আনুগত্য করুন এবং তাঁরই হুকুম মেনে চলুন। হযরত আবুবকর বললেন ঃ এরা দু'জন হলেন খিযির ও ইলিয়াস (আঃ), তাঁরা জানাযায় এসেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— হযরত আবুবকর হযরত ওমরকে বললেন ঃ আমি শুনেছি তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত অস্বীকার কর?

তোমার কি জানা নেই যে, তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে অমুক দিন এবং অমুক দিন কথা বলেছিলেন? আল্লাহ তা'আলাও কোরআন পাকে বলেছেন— إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।

হযরত ওমর বললেন ঃ বিপদে মুষড়ে পড়ার কারণে আমার মনে হল যেন কোরআন মজীদের এ বিষয়বস্তু আমি অন্য কোন দিন শুনিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোরআন পাক যেমন অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি আছে এবং হাদীসও তেমনি, যেমন বলা হয়েছে। আল্লাহ জীবিত— কখনও মরবেন না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর সালাত ও রহমত তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরহের সওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের কাছে বসে পড়লেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দেয়ার জন্য যখন সাহাবীগণ সমবেত হলেন, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলেন ঃ আমরা জানি না, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিভাবে গোসল দেব? অন্যান্য মৃতের ন্যায় বিবস্ত্র করে, না বস্ত্রসহ গোসল? এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নিদ্রা প্রবল করে দিলেন। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি বুকে দাঁড়ি ঠেকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। এ সময় জনৈক অজ্ঞাত বক্তা বলে উঠল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বস্ত্রসহ গোসল দাও। একথায় সকলেই চমকে উঠল এবং এই অদৃশ্য আওয়াজ অনুযায়ী গোসল দেয়া হল। গোসল শেষে কাফন পরানো হলো। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামা খুলতে চাইলে আবার আওয়াজ শুনা গেল,— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামা খুলো না। ফলে, জামা না খুলেই আমরা তাঁকে গোসল দিয়েছি। আমরা তাঁর কোন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে চাইলে তা অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যেত। আমরা ঘরের ভেতর বায়ুর শন্‌শন্‌ শব্দ শুনতে পেতাম।

আবু জাফর (রাঃ) বলেন, কবরে সর্বপ্রথম তাঁর বিছানা ও চাদর বিছানো হল। এরপর তাঁর পরিধেয় বস্ত্র রাখা হল। এগুলোর উপর তাঁকে কাফনসহ রাখা হল— এভাবে তাঁর বস্ত্র যা ছিল, সবই তাঁর সাথে দাফন হয়ে গেল। ওফাতের পর তাঁর কোন ধনসম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। জীবনে তিনি গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে কখনও ইটের উপর ইট রাখেননি। মোটকথা, রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত ঃ হযরত আবুবকর

সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত নিকবর্তী হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে এসে একটি কবিতা পাঠ করলেন, যার অর্থ এই ঃ যখন বুকে শ্বাসরুদ্ধ এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের কোন উপকারে আসে না। তিনি নিজের চেহারা খুলে দিয়ে বললেন ঃ কবিতা আবৃত্তি না করে এই আয়াত তেলাওয়াত কর ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ –

অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যি সত্যি আসবে। এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ।

আমার এ দু'টি বস্ত্র দেখে রাখ। এগুলো ধুয়ে আমাকে কাফন দেবে। কেননা, নতুন বস্ত্রের প্রয়োজন মৃতদের চেয়ে জীবিতদের বেশী। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার অবস্থা দেখার জন্যে আমরা চিকিৎসক ডাকব কি? তিনি বললেন ঃ আমার চিকিৎসক আমাকে দেখে বলে দিয়েছেন— إِنِّيْ فَعَّالٌ لِّمَا أُرِيْدُ – অর্থাৎ, আমি আমার ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করি।

হযরত আবু বকরকে দেখতে এসে সালমান ফারেসী বললেন ঃ হে আবু বকর! আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের জন্যে দুনিয়া জয় করাবেন। তুমি সে দুনিয়া থেকে ততটুকুই নেবে, যতটুকু তোমার দিনাতিপাতের অনুকূলে হয়। মনে রেখ, যে ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারে থাকে। অতএব, আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। করলে উপুড় অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

রোগ বৃদ্ধির দরুন হযরত আবু বকর বাইরে আসতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম অনুরোধ করলেন, আপনি একজনকে নায়েব নিযুক্ত করে দিন। সেমতে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে নায়েব নিযুক্ত করলেন। এতে কেউ কেউ আপত্তি করে বললঃ আপনি একজন কঠোর প্রকৃতির রুক্ষভাষীকে নায়েব নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কি জওয়াব দেবেন? তিনি বললেন ঃ বলব, তোমার সৃষ্টির মধ্যে যে সর্বোত্তম ছিল, তাকেই নায়েব নিযুক্ত করেছি। এরপর হযরত ওমরকে

ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি ওসিয়ত করছি— মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলার কিছু হক দিনের বেলায় রয়েছে, যা তিনি রাতের বেলায় কবুল করেন না এবং কিছু হক রাতের বেলায় রয়েছে, যা দিনের বেলায় কবুল করেন না। ফরয এবাদত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি নফল এবাদত কবুল করেন না। সত্যের অনুসরণের কারণেই কিয়ামতের দিন সত্যাশ্রয়ীদের পাল্লা ভারী হবে। যে পাল্লায় কেবল সত্য রাখা হয়, তার ওজন বেশী হওয়াই সমীচীন। কিয়ামতের দিন হালকা পাল্লাওয়ালাদের পাল্লা একারণেই হালকা হবে যে, তারা দুনিয়াতে মিথ্যার অনুসরণ করেছে এবং পাল্লাকে হালকা মনে করেছে। যে পাল্লায় মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু রাখা হয় না, তার হালকা হওয়াই শোভনীয়। অতএব, হে ওমর! যদি তুমি আমার উপদেশ স্মরণ রাখ, তবে তোমার কাছে মৃত্যু হবে প্রিয়তম। মৃত্যুর আগমন অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তুমি যদি আমার উপদেশ অমান্য কর, মৃত্যুর চেয়ে কঠিন তোমার কাছে কোন কিছু হবে না। অথচ তুমি এ থেকে পালাতে পারবে না।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাত ঃ আমর ইবনে মায়মূন বলেন ঃ যেদিন ফজরের নামাযে হযরত ওমর ছুরিকাহত হন, সেদিন আমিও জামায়াতে দাঁড়ানো ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝখানে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন। তিনি নামাযের কাতারে কোন ত্রুটি দেখলে বলতেন ঃ কাতার সোজা করে নাও। ত্রুটি দূর হয়ে গেলে তিনি সামনে এগিয়ে যেতেন। প্রায়ই প্রথম রাকআতে সূরা ইউসুফ, নাহল অথবা এমনি অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন, যাতে অধিকসংখ্যক মুসল্লী জামায়াতে যোগ দিতে পারে। তিনি আল্লাহু আকবারই বলেছিলেন, এর পরেই আমি শুনলাম তিনি বলছেন— আমাকে কুকুরে মেরে ফেলল, খেয়ে ফেলল। দুর্বৃত্ত কাফের আবু লু'লু' তাকে আহত করার পর দুধারী ছুরি হাতে পালাতে লাগল। যাওয়ার পথে সে ডানে-বামে ছুরি চালিয়ে আরও তেরজনকে আহত করল। তাদের মধ্যে পরে নয়জন মৃত্যুবরণ করে। এক রেওয়ায়েতে সাতজন মারা যাবার কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে জনৈক মুসল্লী তার উপর নিজের চাদর ফেলে দিল। কাফের যখন দেখল, সে ধরা পড়ে গেছে, তখন নিজেই নিজেকে যবাই করে জাহান্নামে পৌঁছে গেল।

আহত হওয়ার পর হযরত ওমর আবদুর রহমান ইবনে আওফকে নামায পড়ানোর জন্যে সামনে এগিয়ে দিলেন। তখন যারা মসজিদে ছিল,

তারা তো এই ঘটনা দেখল; কিন্তু যারা মসজিদের বাইরে আশে-পাশে ছিল, তারা কিছুই জানতে পারল না। তবে হযরত ওমরের আওয়াজ থেমে গেল। তিনি সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ বলতে লাগলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন। সালাম ফিরানোর পর হযরত ওমর হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন ঃ দেখ, আমাকে কে আহত করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ মুগীরা ইবনে শো'বার ক্রীতদাস এ কাণ্ড করেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাকে নিপাত করুক। আমি তো তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যে বলেছিলাম। আল্লাহর শোকর যে, তিনি কোন মুসলমানের হাতে আমাকে মৃত্যু দেননি। তুমি ও তোমার পিতাই মদীনায় অনারব কাফেরদের প্রাচুর্য কামনা কর। এরূপ বলার কারণ এই যে, তখন হযরত আব্বাসের অনেক ক্রীতদাস ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস আরয করলেন ঃ আপনার মরযী হলে সবাইকে মেরে ফেলি। তিনি বললেন ঃ এখন হত্যা করলে কি হবে। এখন তো তারা তোমাদের বুলিই বলতে শুরু করেছে। তোমাদের কেবলার দিকে নামায পড়তে শুরু করেছে। তোমাদের মত হজ্জ করতে শুরু করেছে।

অতঃপর আহত খলীফাকে মসজিদ থেকে তাঁর বাসগৃহে নিয়ে আসা হল। আমরাও সঙ্গে গেলাম। জনসাধারণের অবস্থা ছিল এই যে, সেদিনের পূর্বে যেন তাদের উপর কোন মুসীবত আসেনি। তারা নিজ নিজ মন্তব্য করছিল। কেউ বলছিল ঃ আমার আশংকা, তিনি মারা যাবেন। কেউ বলছিল, কোন আশংকা নেই। ইতিমধ্যে খলীফার জন্যে আঙ্গুরের রস আনা হল। তিনি সেটা পান করতেই পেট দিয়ে বের হয়ে গেল! এরপর দুধ আনা হল। পান করার পর তাও বের হয়ে গেল। তখন সকলেই তাঁর জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেল। জনগণ এসে তার প্রশংসা করছিল। এক যুবক এসে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার জন্যে সুসংবাদ হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ ও প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের কারণে সুউচ্চ মর্তবা অর্জিত হোক। আপনি শাসক হয়েছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি বললেন ঃ এসব বিষয়ের মাধ্যমে আমি কোন লাভ-লোকসান চাই না। যুবক যখন প্রস্থান করতে লাগল, তখন তার পায়জামা মাটি স্পর্শ করছিল। হযরত ওমর বললেন ঃ এই যুবককে আমার কাছে আন। যুবক ফিরে এলে তিনি

বললেন ঃ ভাতিজা! তোমার পায়জামা উঁচু কর। এতে ধুলাবালু ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে এবং তা তাক্ওয়ারও নিকটবর্তী।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ছেলেকে বললেন ঃ আবদুল্লাহ, দেখ আমার ঋণ কি পরিমাণ। হিসাব করে দেখা গেল ছিয়াশি হাজারের কাছাকাছি। তিনি বললেন ঃ যদি আমার পরিবারের ধন-সম্পদ দিয়ে ঋণ শোধ হয়ে যায়, তবে এ থেকেই শোধ করে দিয়ো। অন্যথায় আদী ইবনে কা'বের বংশধরের কাছ থেকে চেয়ে নিও। যদি তাতেও না কুলায়, তবে কোরায়শের কাছ থেকে নিয়ে শোধ করবে। কোরায়শ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে নেবে না। এখন তুমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে যাও এবং বল ঃ ওমর আপনাকে সালাম বলেছেন। 'আমীরুল মুমিনীন' বলবে না। কারণ, আমি আজ মুমিনদের আমীর নই। আরও বলবে— তিনি তার দু'জন সঙ্গীর সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে সালামের পর অনুমতি চাইলেন। তিনি তখন বসে কাঁদছিলেন। আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব আপনাকে সালাম বলেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবু বকরের সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। হযরত আয়েশা বললেন, আমি স্থানটি নিজের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আমি ত্যাগ স্বীকার করব এবং ওমরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেব। আবদুল্লাহ পিতার কাছে ফিরে এলে লোকেরা হযরত ওমরকে বলল ঃ আবদুল্লাহ হযরত আয়েশার কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে উঠাও। এক ব্যক্তি তাকে বসিয়ে দিলে তিনি পুত্রকে বললেন ঃ কি জওয়াব এনেছ বল। আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ আপনার প্রার্থনা হযরত আয়েশা মনযুর করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ, এর চেয়ে জরুরী আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার জানাযা নিয়ে হযরত আয়েশার দরজায় যাবে। সালাম করার পর বলবে— ওমর অনুমতি চায়। অনুমতি দিলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আর যদি অনুমতি না হয়, তবে মুসলমানদের কবরস্তানে নিয়ে দাফন করে দেবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এলেন। তাঁকে দেখে আমরা সরে গেলাম। তিনি হযরত ওমরের কাছে এসে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর তিনি অন্দরে চলে গেলেন।

অন্দর থেকে তার কান্নার আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। এরপর লোকেরা আরয করল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদেরকে কিছু ওসিয়ত করুন এবং আপনি খলীফা নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি বললেন ঃ খেলাফতের জন্যে আমি যাদেরকে যোগ্য মনে করি, তারা হলেন হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবায়র, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। আমার পুত্র আবদুল্লাহও তোমাদের কাছে যাবে। কিন্তু খেলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সা'দ যদি খলীফা হতে পারে, তবে ভাল। নতুবা যে-ই খলীফা হয়, সে যেন সা'দের সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন করে। কেননা, আমি তাকে কোনরূপ অক্ষমতা ও অসাধুতার কারণে পদচ্যুত করিনি। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসিয়ত করছি যে, যারা প্রথমে হিজরত করে মদীনায় এসেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হবে এবং তাদের সম্মান ও ইযযত অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আরও ওসিয়ত করছি যে, আনসার ভাইদের সাথে কল্যাণমূলক ব্যবহার করতে হবে। তারা মদীনায় সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে এবং সবার আগে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের দুষ্কর্মীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আরও ওসিয়ত করছি যে, পার্শ্ববর্তী শহরবাসীদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে যা অতিরিক্ত হবে অথবা তারা মনের খুশীতে দেবে, কেবল তাই নেবে। আরবদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করে তাদেরই দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করে দেবে। যিম্মিদের সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং তাদের রক্ষার জন্যে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদেরকে দেবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন আমরা জানাযা নিয়ে রওয়ানা হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আয়েশার খেদমতে গিয়ে সালাম করলেন এবং বললেন ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চান। হযরত আয়েশা বললেন ঃ ভেতরে নিয়ে এস। অতঃপর ভিতরে নিয়ে তাঁর উভয় সহচরের পাশে দাফন করা হল।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে—জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছেন—ওমরের মৃত্যুতে ইসলাম কাঁদবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন ওমরের লাশ খাটে রাখা হল, তখন জনতা এসে জানাযাকে থামিয়ে দিল। তারা জানাযা উঠার পূর্বেই দোয়া করছিল ও নামায পড়ছিল। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমার উভয় কাঁধ ধরে আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। আমি পেছন ফিরে হযরত আলীকে দেখতে

পেলাম। তিনি হযরত ওমরের জন্যে রহমতের দোয়া উচ্চারণ করলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর! তুমি নিজের পরে এমন কাউকে রেখে যাওনি, যার মত আমল করে মৃত্যুবরণ করাকে আমি পছন্দ করতে পারি। তোমার মত আমল করেই আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া আমার পছন্দনীয়। আল্লাহর কসম, আমার প্রবল ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার দুই সহচরের সাথেই রাখবেন। কারণ আমি অধিকাংশ সময় রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনতাম— আমি, আবু বকর ও ওমর গেলাম, আমি, আবুবকর ও ওমর বের হলাম, আবুবকর ও ওমর ভিতরে এল ইত্যাদি। প্রত্যেক বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এভাবে বলতে দেখে আমার মনে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনকে একত্রে রাখবেন।

হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর ওফাত ঃ হযরত ওসমানের শাহাদতের ঘটনা সুবিদিত। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ওসমান যখন অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন আমি তাঁকে সালাম করতে এলাম এবং ভিতরে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন ঃ ভাই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আজ রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ওসমান! শত্রুরা তোমাকে ঘেরাও করেছে? আমি আরয করলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমাকে তৃষ্ণার্ত রেখেছে? আমি আরয করলাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি একটি পানিভর্তি বালতি ঝুলিয়ে দিলেন। আমি পেট ভরে পানি পান করলাম। তার শীতলতা আমি বুকে ও কাঁধে এখনও অনুভব করছি। তিনি আরও বললেন ঃ যদি চাও সাহায্য লাভ করে তাদের উপর বিজয়ী হতে পার অথবা আমার কাছে এসে ইফতার কর। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইফতার করাকে পছন্দ করেছি। সেমতে সেদিনেই হযরত ওসমান শাহাদত বরণ করেন।

যারা হযরত ওসমানকে আহত হওয়ার পর রক্তের উপর গড়াগড়ি দিতে দেখেছিল, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রক্তের উপর গড়াগড়ি দেয়ার সময় হযরত ওসমান কি বলেছিলেন? লোকেরা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি— ইলাহী! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে একতা দান করুন। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়া করতেন যে, তাদের মধ্যে যেন একতা না হয়, তবে কোন সময়ই তাদের মধ্যে একতা হত না।

ছামামা ইবনে হাযন কায়শরী বলেন ঃ যখন হযরত ওসমান ঘরের ছাদ থেকে নীচে জনতার দিকে দেখেছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে দু'ব্যক্তি আপনাদেরকে এখানে সমবেত করেছে, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। তাদেরকে ডাকা হল। তারা এমনভাবে এল, যেমন দু'টি গাধা অথবা দু'টি উট আসে। হযরত ওসমান জনতার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা জান যে, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন, তখন রওমা কূপ ছাড়া মদীনায় কোথাও মিঠা পানির অস্তিত্ব ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কেউ আছ কি, যে এই কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে দেবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতে উত্তম প্রতিদান পাবে। তখন আমি আমার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে এই কূপটি ক্রয় করেছিলাম। কিন্তু তোমরা আজ আমাকে এই কূপের পানি পান করতে দিচ্ছ না, দরিয়ার পানিও দিচ্ছ না। জনতা বলল ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তিনি আরও বললেন ঃ তোমরা জান, আমি নিঃস্ব ও নিরস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলাম? জনতা বলল, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান, মসজিদে নামাযীদের স্থান সংকুলান হত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন— অমুকের জমি ক্রয় করে মসজিদটি সম্প্রসারিত করবে— এমন কেউ আছ কি? তখন আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে সেই জমি ক্রয় করেছি। কিন্তু আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়তে দিচ্ছ না। জনতা বলল ঃ এ ঘটনাও সত্য।

হযরত ওসমান আরও বললেন ঃ তোমরা জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় ছাবীর পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও আমি। এমন সময় পাহাড় নড়তে লাগল, যার ফলে কয়েক খণ্ড পাথরও নীচে খসে পড়ল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাহাড়ের গায়ে লাথি মেরে বললেন— থেমে যা হে ছাবীর! তোর উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছে। জনতা বলল ঃ আপনার বর্ণনা সত্য। তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! কা'বার পালনকর্তার কসম, এই জনতা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি নিঃসন্দেহে শহীদ।

জনৈক শায়খ বর্ণনা করেন— হযরত ওসমান আহত হওয়ার পর তাঁর

শ্মশ্রু মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তখন তাঁর মুখে ছিল এই দোয়া—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

হযরত আলী (রাঃ)-এর ওফাত ঃ ইছবাগ হানযাল বলেন ঃ যে রাতের ভোরে হযরত আলী (রাঃ) ঘাতকের হাতে আহত হন, সে রাতে তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ইবনে তাইয়াহ ফজরের সময় তাঁর কাছে এসে নামাযের কথা বলে। তিনি বিলম্ব করলেন এবং শুয়ে রইলেন। ইবনে তাইয়াহ পুনরায় এল। এবারও তিনি গাত্রোত্থানে বিলম্ব করলেন। তৃতীয় বার নামাযের কথা বলার পর তিনি শয্যা ত্যাগ করে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি ছোট দরজার কাছে পৌঁছলেন, তখন নরাধম ইবনে মুলজেম তাঁর উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

হযরত আলীর কন্যা উম্মে কুলছুম বাইরে এসে বলতে লাগলেন ঃ ফজরের নামাযের কি হল যে, আমার স্বামী হযরত ওমরও এ নামাযেই শহীদ হয়েছেন এবং আমার পিতাও এ নামাযেই শাহাদত লাভ করলেন!

এক বৃদ্ধ কোরায়শ বর্ণনা করেন ঃ অভিশপ্ত ইবনে মুলজেম হযরত আলী (রাঃ)-কে আহত করলে তিনি বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

মোহাম্মদ ইবনে আলী বলেন ঃ আমার পিতা আহত হওয়ার পর নিজের পুত্রদেরকে ওসিয়ত করলেন। এরপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু বলেননি।

জীবন সায়াহ্নে খলীফা ও আমীরগণের উক্তি ঃ হযরত আমীর মোয়াবিয়ার (রাঃ) মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিল। তিনি তাসবীহ ও যিকির শুরু করলেন। অতঃপর কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ হে মোয়াবিয়া! বার্ধক্য ও ভগ্নদশায় বুঝি আল্লাহ তা'আলার যিকিরের কথা মনে পড়েছে? এর সময় তো তখন ছিল, যখন যৌবনের শাখা সজীব ছিল। একথা বলে তিনি প্রচুর কাঁদলেন। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে তিনি বললেন ঃ ইলাহী! এই কঠোরপ্রাণ বৃদ্ধের প্রতি রহম কর। এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর। নিজের সহনশীলতার মাধ্যমে এই ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে নাও, যে তোমাকে ছাড়া কারও কাছে আশা করে না এবং কারও উপর ভরসা করে না।

বর্ণিত আছে, আমীর মোয়াবিয়ার সর্বশেষ খোতবা ছিল এই ঃ লোক সকল! মানুষ যে ফসল বপন করে, তাই কাটে। আমি তোমাদের শাসক

ছিলাম। আমার পরে যে শাসক আসবে, সে আমার চেয়ে খারাপই হবে; যেমন আমার পূর্ববর্তী শাসক আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। হে এয়াযীদ! আমার মৃত্যু হয়ে গেলে কোন বুদ্ধিমান ও সুধী ব্যক্তি দ্বারা আমার গোসল দেবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। তাকে বলবে যেন উত্তমরূপে গোসল দেয় এবং আল্লাহু আকবার সজোরে বলে। এরপর ধনভাণ্ডারে দেখবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কিছু বস্ত্র এবং তাঁর কেশ ও নখের কিছু কিছু ক্ষুদ্রাংশ একটি রোমালে বাঁধা আছে। ক্ষুদ্রাংশগুলো নিয়ে আমার নাকে, মুখে, কানে ও চোখে স্থাপন করবে। আর বস্ত্রকে কাফনের ভেতরে আমার উপর রেখে দেবে। কাফন পরিয়ে কবরে রেখে দেয়ার পর তোমরা মোয়াবিয়া ও আরহামুর রাহিমীনকে একাকী ছেড়ে দিয়ো।

মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর বলেন, অন্তিম মুহূর্তে আমীর মোয়াবিয়া বলতে লাগলেন ঃ চমৎকার হত যদি আমি কোরায়শের একজন অভুক্ত ব্যক্তি হতাম এবং খেলাফতের কোন কিছুর অধিকারী না হতাম।

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ওফাত নিকটবর্তী হলে সে জনৈক ধোপাকে দামেশকের আশে-পাশে কাঠে পিটিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতে দেখল। আবদুল মালেক বলল ঃ কি চমৎকার হত যদি আমি ধোপা হতাম! প্রত্যহ নিজের হাতের কামাই খেতাম! দরবেশ আবু হাযেম এ কথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হাজার শোকর, তিনি এই শাসকবর্গকে এমন বানিয়েছেন যে, মৃত্যুর সময় তারা আমাদের দরিদ্রাবস্থা কামনা করেন। কিন্তু আমাদের যখন মৃত্যু আসে, তখন আমরা তাদের অবস্থা কামনা করি না।

মৃত্যুর পূর্বে কেউ আবদুল মালেককে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ এমন পাচ্ছি, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِكُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছে এসেছ এক এক করে, যেমন আমি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি যে আসবাবপত্র দিয়েছিলাম, তা তোমরা পেছনে ছেড়ে এসেছ।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল

মালেক বলেন ঃ ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় দোয়া করতেন— ইলাহী! আমার মৃত্যুকে মানুষের কাছে প্রকাশ করো না তা এক মুহূর্তের জন্য হলেও। সেমতে যেদিন তাঁর ওফাত হয়, সেদিন আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলাম। তাঁর মধ্যে ও আমার মধ্যে একটি দরজার ব্যবধান ছিল। আমি শুনলাম, তিনি এ আয়াতখানি পাঠ করছেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ, সে পরকালীন গৃহ আমি তাদেরকে দেব, যা পৃথিবীতে আগ্রাসন চায় না এবং গোলযোগও চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যে।

এরপর তিনি চুপ করলেন। আমি কোন আওয়াজ ও সাড়া-শব্দ না পেয়ে এক গোলামকে পাঠালাম— দেখ, ঘুমাচ্ছেন কি না। সে কাছে গিয়েই চিৎকার করে উঠল। আমি দ্রুত ধাবিত হলাম। তিনি তখন আর বেঁচে নেই। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। ফলে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু প্রকাশ পেল না।

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ওফাতের পূর্বে কেউ তাঁর কাছে প্রার্থনা করল— আমীরুল মুমিনীন! কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার বর্তমান এ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করছি। একদিন তোমারও এ অবস্থাই হবে।

বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আযীয যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর জন্যে একজন চিকিৎসক ডাকা হল। সে অবস্থা দেখে বলল ঃ আপনাকে বিষ দেয়া হয়েছে। আপনি বিষের ক্রিয়া অনুভব করছেন কি? তিনি বললেন ঃ যখন বিষ আমার পেটে পড়েছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। চিকিৎসক বলল ঃ তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় আপনার প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ প্রাণ তো পরওয়ারদেগারের কাছেই যাবে। তাই যাওয়ার শ্রেষ্ঠতম জায়গা। আল্লাহর কসম, যদি আমি জানতে পারি যে, আমার রোগের প্রতিকার আমার কানের লতির কাছেই রয়েছে, তবু আমি হাত কান পর্যন্ত তুলে তা

গ্রহণ করব না। ইলাহী! ওমরের জন্যে তোমার সাক্ষাতে কল্যাণ রাখ। এর অল্প দিন পরেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

বর্ণিত আছে— ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি কাঁদলেন। এক ব্যক্তি আরয করল— আমীরুল মুমিনীন! কান্নার কারণ কি? আপনার জন্যে সুসংবাদ— আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দিয়ে অনেক সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কেঁদে কেঁদেই বললেন ঃ আমাকে কি হাশরের ময়দানে দাঁড় করানো হবে না? জনগণের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না? আল্লাহর কসম, যদি আমি কেবল ন্যায়বিচারই করতাম, তবু আল্লাহ তা'আলার শিখিয়ে দেয়া ছাড়া তাঁর সামনে আমার যুক্তি সম্পন্ন করতে পারতাম না। আর যে ক্ষেত্রে অনেক ন্যায়বিচার বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে ভয় না করে উপায় আছে কি? একথা বলে তিনি অনেক কাঁদলেন এবং এরপর অল্প দিনই জীবিত থাকেন।

বর্ণিত আছে— অন্তিম সময়ে তিনি বললেন ঃ আমাকে বসিয়ে দাও। বসিয়ে দেয়ার পর তিনি বললেন ঃ ইলাহী! তুমি আদেশ করেছ, আমি তা পালনে ত্রুটি করেছি। তুমি নিষেধ করেছ, আমি মান্য করিনি। একথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন ঃ কিন্তু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, তাওহীদে আমি কোন ত্রুটি করিনি। অতঃপর তিনি মাথা তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন ঃ আমি কিছু লোককে উপস্থিত দেখছি। তারা না মানুষ, না জিন। এরপরই তাঁর ওফাত হয়ে গেল।

খলীফা হারুনুর রশীদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মৃত্যুর সময় নিজের কাফন নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। সে কাফনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন—

مَا أَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ -

অর্থাৎ, আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসেনি। আমার সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে গেছে।

মু'তাসিম বিল্লাহ মৃত্যুর সময় বললেন— যদি আমি জানতাম, আমার জীবন সামান্য, তবে যা করেছি তা করতাম না।

মুনতাসির মৃত্যুর সময় খুবই অস্থির ছিলেন। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ আপনার কোন ভয় নেই। পেরেশান হবেন না। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার এতটুকুই যে, দুনিয়া গত হয়েছে এবং আখেরাত এসে গেছে।

আমর ইবনে আছেরের কাছে ধন-সম্পদের কয়েকটি সিন্দুক ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি এগুলো দেখে পুত্রদেরকে বললেন ঃ এগুলো কে নেবে? হায়, এগুলোতে যদি ছাগলের বিষ্ঠা থাকত!

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মৃত্যুর সময় বলল ঃ ইলাহী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। লোকেরা বলে তুমি নাকি ক্ষমা করবে না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয হাজ্জাজের বক্তৃতায় মুগ্ধ হতেন এবং তার প্রতি ঈর্ষা করতেন। হযরত হাসান বসরীকে হাজ্জাজের এই দোয়ার কথা বলা হলে তিনি বললেন ঃ হাজ্জাজ এ কথাটি সরলভাবেই বলেছিল কি? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করলে আশ্চর্যের কিছু হবে না।

হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ ইলাহী! আমি তোমাকে ভয় করি এবং তোমার কাছে আশা করি। ইলাহী, তুমি জান আমি খাল খনন ও বৃক্ষ রোপণের জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাকে পছন্দ করতাম না; বরং গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসার্ত থাকা, কালের বিপদাপদ সহ্য করা এবং যিকিরের মজলিসে নতজানু হয়ে বসার জন্যে পছন্দ করতাম। তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে যখনই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত, তিনি চোখ খুলে বলতেন— ইলাহী! তুমি যত ইচ্ছা আমার গলা চেপে ধর। তোমার ইযযতের কসম, আমার অন্তর তোমাকে মহব্বত করে।

মৃত্যুর পূর্বে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি দুনিয়ার মহব্বতে অস্থির হয়ে কাঁদছি না; বরং আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, দুনিয়াতে আমাদের পাথেয় ততটুকুই হওয়া উচিত, যতটুকু মুসাফিরের হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যখন ওফাত হল, তখন তিনি যা কিছু ছেড়ে যান, তার মূল্য দশ দেরহামের কিছু বেশী। অর্থাৎ, চার টাকার কাছাকাছি ছিল।

হযরত বেলালের কানে যখন মৃত্যুর আযান পৌঁছল, তখন তাঁর স্ত্রী ব্যথিত স্বরে বলল ঃ হায়, কি দুঃখ! তিনি বললেন ঃ না বরং কি আনন্দ! কেননা, আগামী কাল আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর দলের সাথে মিলিত হব।

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) মৃত্যুর সময় চোখ খুলে হেসে উঠেন এবং বলেন ঃ

لمثل هذا فليعمل العاملون -

অর্থাৎ, এরই জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত।

হযরত ইবরাহীম নখঈ মৃত্যু নিকটবর্তী হলে কাঁদতে থাকেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার দূতের অপেক্ষায় আছি। দেখি, সে আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, না দোযখের?

আমর ইবনে আবদুল কায়েস ওফাতের পূর্বে এমনি প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ আমি না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদি, না দুনিয়ার লোভে কাঁদি; বরং দুপুরের পিপাসা এবং শীতের রাতের জাগরণ ফওত হয়ে যাবে বলে কাঁদছি।

হযরত ফুযায়ল (রহঃ) ওফাতের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর চক্ষু খুলে বললেন ঃ আফসোস, এত দীর্ঘ সফর আর এত অল্প পাথেয়!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি গোলাম নসরকে বললেন ঃ আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। নসর কাঁদতে লাগল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ আমার মনে পড়ছে। এখন আপনি ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন! তিনি বললেন ঃ চুপ কর। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলাম তিনি যেন আমাকে বিত্তবানদের মত জীবন দেন এবং ফকীর ও নিঃস্বদের মত মরণ দেন। আমার সামনে কালেমা পাঠ করবে। যে পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে অন্য কথা বের না হয়, দ্বিতীয় বার কালেমা পড়বে না।

জারীরী বলেন ঃ হযরত জুনায়দের মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার ও নববর্ষ। তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন এবং তদবস্থায়ই কোরআন খতম করে নেন। আমি আরয করলাম ঃ এই সংকট মুহূর্তে আপনি কোরআন খতম করলেন? তিনি বললেন ঃ আমার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার অধিকার আমারই বেশী। এখন আমার আমলনামা বন্ধ হওয়ার সময়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ নমশাদ দাইনুরীর খেদমতে ছিলাম। এমন সময় এক ফকীর এসে আসসালামু আলাইকুম বলে জিজ্ঞেস করল ঃ এখানে কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা আছে কি? যেখানে মানুষ মরতে পারে? লোকেরা তাকে পানির কাছাকাছি একটি জায়গা দেখিয়ে দিল। ফকীর

নতুন উযু করে কয়েক রাকআত নামায পড়ল। অতঃপর সে জায়গায় গেল এবং পা ছড়িয়ে মরে গেল।

হযরত জুনায়দকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলা হল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি বললেন ঃ আমি কি এটা ভুলে গেছি যে, স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

জাফর ইবনে নাসির হযরত শিবলী (রহঃ)-এর খাদেম বকরান দাইনুরীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মৃত্যুর সময় তুমি হযরত শিবলীর অবস্থা কেমন দেখেছ? বকরান বলল ঃ হযরত শিবলী আমাকে বললেন, আমার কাছে এক ব্যক্তির এক দেরহাম পাওনা ছিল, যা অন্যায়ভাবে আমার কাছে এসেছিল। যদিও আমি সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজারো দেরহাম দান করেছি, কিন্তু আমার অন্তরে এর চেয়ে বড় কোন বোঝা নেই। এরপর তিনি বললেন ঃ নামাযের জন্যে আমাকে উযু করিয়ে দাও। আমি উযু করালাম; কিন্তু দাড়িতে খেলাল করা ভুলে গেলাম। তখন তাঁর যবান বন্ধ ছিল। তিনি আমার হাত ধরে আপন দাড়িতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর ওফাত হয়ে গেল। বকরানের এ বর্ণনা শুনে জা'ফর কেঁদে বললেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল, জীবনের শেষ মুহূর্তেও যার একটি মোস্তাহাব কাযা হয়নি?

এগুলো হচ্ছে সাধক ও ওলীগণের অন্তিমকালীন অবস্থা ও উক্তি। তাঁদের অবস্থা যেমন বিভিন্ন ছিল, তেমনি উক্তিও বিভিন্ন। কারও উপর ভয় প্রবল ছিল এবং কারও উপর আশা। আবার কারও উপর প্রবল ছিল অনুরাগ ও মহব্বত। প্রত্যেকেই নিজের হাল অনুযায়ী কথাবার্তা বলেছেন। সুতরাং সকলের উক্তিই সঠিক ও যথার্থ।

জানাযা ও কবরস্তানে সাধকগণের উক্তি ঃ বুদ্ধিমানের জন্যে জানাযার মধ্যেও শিক্ষা ও হুশিয়ারি লাভ করার অনেক অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফেল, জানাযা দেখে তাদের অন্তরের কঠোরতা ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি পায় না। কারণ, তাদের ধারণা থাকে যে, তারা সর্বদা অন্যদের জানাযাই দেখবে। তারা একথা ভাবে না যে, তাদেরকেও একদিন খাটে বহন করা হবে। এটা তাদের নিছক একটি কুসংস্কার। তাদের চিন্তা করা উচিত, যত মানুষকে খাটে বহন করা হয়, তাদের সবাই এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তাদের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।

অতএব প্রত্যেকের উচিত, যখন জানাযা দেখে, তখন নিজেকে তার মধ্যে ধরে নেয়া। কেননা, অচিরেই তা হবে, হয় দ্বিতীয় দিন অথবা তৃতীয় দিন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন জানাযা দেখতেন, তখন বলতেন— চল, আমরাও তোমার পেছনে আসছি। মকহুল দামেশকী জানাযা দেখে বলতেন— তুমি সকালে যাচ্ছ, আমরা বিকালে যাব। ওসায়দ ইবনে হুযায়র বলেন— আমি যখনই কোন জানাযায় উপস্থিত হয়েছি, আমার মনে সর্বক্ষণ এ চিন্তাই ঘুরাফেরা করেছে যে, এ মৃতের সাথে কি আচরণ হবে এবং এর কি পরিণতি হবে?

মালেক ইবনে দীনারের ভাইয়ের ইন্তেকাল হলে তিনি জানাযার সাথে বের হয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন— আল্লাহর কসম, তোমার পরিণাম না জানা পর্যন্ত আমার চোখ ঠাণ্ডা হবে না। অবশ্য, একথা সারা জীবনেও জানা যাবে না।

আমাল বলেন ঃ আমরা জানাযায় উপস্থিত হতাম; কিন্তু একথা জানার উপায় থাকত না যে, সমবেদনা কার কাছে প্রকাশ করব। কেননা, সকলেই সমান দুঃখিত থাকত। ছাবেত বানানী বলেন ঃ আমরা জানাযায় উপস্থিত হয়ে মুখ ঢেকে ক্রন্দনকারীদের ছাড়া কাউকে দেখতাম না। মোটকথা, পূর্ববর্তীরা মৃত্যুকে এভাবে ভয় করত। কিন্তু আজকাল ব্যাপার উল্টে গেছে। এখন যারা জানাযার সাথে থাকে, তাদের অধিকাংশই হাসে, কৌতুক করে এবং মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তিরই কথাবার্তা বলে। মৃতের আত্মীয়রাও ভাবে, কিভাবে সম্পত্তির কিছু অংশ তারাও পাবে। কেউ চিন্তা করে না, তার জানাযা যখন বের হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কি হবে? তার দশা কি হবে? এই উদাসীনতার একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের কঠোরতা। অধিক গোনাহ করতে করতে আমাদের মন কঠোর হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহকে, কিয়ামতের দিনকে এবং আখেরাতের ভয়কে আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেন।

জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে মৃতের জন্যে কান্নাকাটি করা। কিন্তু জ্ঞানী হলে নিজের অবস্থার জন্যেও কাঁদা উচিত। কেননা, মৃতের জন্যে কান্নাকাটির তুলনায় নিজের অবস্থার জন্যে কান্নাকাটি করা অধিক সমীচীন। যয়তুন ব্যবসায়ী ইবরাহীম কিছু লোককে মৃতের

জন্যে কাঁদতে দেখে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ অবস্থার জন্যে কাঁদাকাটি কর, তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। কেননা, মৃত ব্যক্তি তিনটি ভয় অতিক্রম করে চলে গেছে। এক, সে মালাকুল মওতের আকৃতি দেখে নিয়েছে। দুই, সে মৃত্যুর তিক্ততা আস্বাদন করেছে। তিন, খাতেমার আশংকা থেকেও সে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এসব ভয় এখনও তোমাদের সম্মুখে রয়ে গেছে।

জানাযায় অংশগ্রহণের শিষ্টাচার ঃ জানযায় অংশ গ্রহণের শিষ্টাচার হচ্ছে হচ্ছে চিন্তা করা, গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া এবং বিনম্রভাবে জানাযার সামনে চলা। জানাযার আরও একটি শিষ্টাচার হচ্ছে মৃতের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, যদিও সে পাপাচারী ও ফাসেক হয়ে থাকে এবং নিজের প্রতি কুধারণা রাখা যদিও বাহ্যত সাধু হয়। কেননা, খাতেমার অবস্থা বিপদসংকুল। তার স্বরূপ কারও জানা নেই। এ কারণেই আমর ইবনে যর থেকে বর্ণিত আছে যে, তার জনৈক পাপাচারী প্রতিবেশী মারা গেলে অনেকেই তার জানাযায় যেতে রাযী হল না। কিন্তু আমর ইবনে যর গেলেন এবং জানাযার নামায পড়লেন। মৃতকে কবরে নামানো হলে তিনি কবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে অমুক! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি সারা জীবন তাওহীদের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং নিজের মাথা সেজদায় ভূলুণ্ঠিত করেছ। যারা বলে, তুমি গোনাহগার ও পাপাচারী, তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, আমাদের মধ্যে কে গোনাহগার ও পাপাচারী নয়?

বর্ণিত আছে, বসরার আশপাশে জনৈক নামকরা দুষ্কৃতকারী মারা গেলে তার স্ত্রী জানাযায় সাহায্য করার জন্যে কাউকে খুঁজে পেল না। কারণ, অধিক কুকর্মের কারণে কেউ তার ধারে-কাছে আসতে সম্মত হল না। সে মজুরী দিয়ে কিছু লোক এনে জানাযার ব্যবস্থা করল এবং নামাযের জায়গায় নিয়ে গেল। কিন্তু কেউ তার জানাযার নামায পড়ল না। অগত্যা সে মৃতকে দাফন করার জন্যে জঙ্গলে নিয়ে গেল। সেখান থেকে কাছেই এক পাহাড়ে একজন বড় দরবেশ বাস করতেন। মৃতের স্ত্রী দরবেশকে দেখল, যেন তিনি জানাযার অপেক্ষায়ই রয়েছেন। জানাযা পৌঁছে গেলে দরবেশ নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নামাযের জন্যে দরবেশ পাহাড় থেকে নেমেছেন - এ সংবাদ দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরবাসীরাও চলে এল এবং দরবেশের সাথে নামাযে শরীক হল। কিন্তু সবাই বিস্মিত

ছিল যে, দরবেশ কিরূপে এ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন! এ মর্মে দরবেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ আমাকে স্বপ্নে কেউ বলল, পাহাড় থেকে নেমে অমুক জায়গায় যাও। সেখানে তুমি একটি জানাযা পাবে, যার সাথে মৃতের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তার জানাযার নামায পড়। কারণ, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। এতে লোকদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। দরবেশ মৃতের স্ত্রীকে ডেকে এনে সেই ব্যক্তির অবস্থা ও অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বলল ঃ তার অভ্যাস ও চরিত্র সবারই জানা। সারাদিন পানশালায় পড়ে থেকে মদ্যপান করত। দরবেশ বললেন ঃ চিন্তা করে বল, তার কোন সৎকর্মও তোমার মনে পড়ে কি না। সে বলল ঃ হ্যাঁ, তিনটি বিষয় ছিল। এক, প্রত্যহ সকালে যখন নেশার ঘোর কেটে যেত, তখন পোশাক বদলিয়ে উযু করত এবং ফজরের নামায জামাআতে আদায় করত। এরপর পানশালায় পৌঁছে কুকর্মে লিপ্ত হত। দুই, কখনও তার ঘর এতীম-শূন্য থাকত না; দু'একজন এতীম সর্বদাই থাকত। তাদের সাথে সে আপন সন্তানের চেয়েও বেশী সদ্ব্যবহার করত। তাদের খোঁজখবর নিত। তিন, রাতে যখন তার নেশা কিছুটা প্রশমিত হত, তখন অন্ধকার রাতে কান্নাকাটি করে বলত ঃ ইলাহী, তুমি তোমার দোযখের কোন্ অংশটি এই নাপাক অধম দ্বারা পূর্ণ করতে চাও? একথা শুনে দরবেশের সন্দেহ দূর হল এবং তিনি আপন নিবাসে ফিরে গেলেন।

কবরের অবস্থা সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি ঃ যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ সর্বাধিক দরবেশ (দুনিয়াত্যাগী) কে? তিনি বললেন ঃ যে কবরকে এবং নিজের গলে যাওয়াকে বিস্মৃত হয় না। অধিক পার্থিব সাজসজ্জা বর্জন করে। অক্ষয় বস্তুকে ধ্বংসশীল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়। আগামী কালকে নিজের জীবনের মধ্যে গণ্য করে না। নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণনা করে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কবরস্তানে বসে থাকেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কবরবাসীদেরকে উত্তম প্রতিবেশী পেয়েছি এবং আমি তাদেরকে প্রতিবেশী বলে বিশ্বাস করি। কারণ, তারা মুখ বন্ধ রাখে এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مارأيت منظرا الا والقبراقطع منه

অর্থাৎ, আমি কবরের মত এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমরা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে কবরস্তানে গেলাম। তিনি একটি কবরের কাছে বসে কাঁদলেন। আমি অন্যদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। আমিও তাঁর দেখাদেখি কাঁদতে লাগলাম। অন্যরাও কাঁদল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা আরয করলাম ঃ আপনার কান্নার কারণে আমরা কাঁদছি। তিনি বললেন ঃ এ কবরটি আমার মা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর তাঁর মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করার অনুমতি চাইলে তা নামনযুর করা হল। মায়ের জন্যে সন্তানের মন যেমন নরম হয়, আমার মনও তেমনি নরম হয়েছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন কান্নার আতিশয্যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— কবর আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল। মৃত ব্যক্তি এ মনযিলটি নিরাপদে পার হয়ে গেলে অন্যান্য মনযিল তার জন্যে সহজ হয়। পক্ষান্তরে এখানে নাজাত না পেলে অন্যান্য মনযিল আরও সুকঠিন হয়ে যায়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, আমর ইবনুল আস (রাঃ) চলার পথে একটি কবরস্তান দেখে নেমে পড়লেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। সহচররা বলল ঃ আজ আপনি এমন করলেন, যা এর আগে কখনও করেননি। এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি কবরবাসীদেরকে এবং তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে অন্তরায়ের বিষয়টিকে মনে করে দু'রাকআত নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ উত্তম মনে করেছি।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায়ই কবরস্তানে বসে থাকতেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ঃ আমি এমন লোকদের মধ্যে বসি, যারা আমাকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে গেলে আমার গীবত করে না।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) রাতের বেলায় কবরস্তানে যেতেন এবং কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ হে কবরবাসীগণ, তোমাদের কি হল যে, আমি ডাকলে তোমরা সাড়া দাও না? এরপর বলতেন ঃ হ্যাঁ, তাদের সাড়া দেয়ার পথে একটি অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমিও যেন তাদেরই মত একজন। এরপর তিনি নামাযে মনোনিবেশ করতেন এবং ফজর পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) জনৈক সহচরকে বললেন ঃ আমি রাত জেগে কবর ও কবরবাসীদের অবস্থা চিন্তা করেছি। তুমি যদি মৃত্যুর তিন দিন পর মৃতের অবস্থা দেখ, তবে তার কাছেই থাকবে না যদিও পূর্বে তার সাথে তোমার অসাধারণ প্রেম ও ভালবাসা থাকে। কারণ, তুমি কবরে দেখবে অসংখ্য কীট দৌড়াদৌড়ি করছে, পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, মৃতের বর্ণ ও গন্ধ বিগড়ে গেছে, কীটেরা কিলবিল করে দেহকে খেয়ে যাচ্ছে এবং কাফন মলিন হয়ে গেছে। একথা বলে তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

হাতেম আসাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরস্তানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের অবস্থা চিন্তা করে না এবং মৃতদের জন্যে দোয়া করে না, সে নিজের এবং মৃতদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রবী' ইবনে খায়ছাম নিজের ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন। তিনি যখনই অন্তরের কঠোরতা অনুভব করতেন, তখনই কবরে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন। এরপর বলতেন—

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ -

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, আমাকে ফিরিয়ে দাও, য়াতে কিছু ভাল কাজ করতে পারি।

এ আয়াতটি কয়েক বার আবৃত্তি করতেন। অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন - হে রবী', এখন তো তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার আমল কর।

মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন ঃ আমি একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে কবরস্তানে গেলাম। তিনি কবরগুলোকে দেখে কাঁদলেন। অতঃপর আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে মায়মুন, এগুলো আমার বাপ-দাদা অর্থাৎ উমাইয়া বংশীয় শাসকগণের কবর। তারা যেন দুনিয়াবাসীদের সাথে তাদের আনন্দ-উল্লাসে কখনও শরীকই ছিলেন না। দেখ, কেমন বিচ্ছিন্ন পড়ে আছেন। তাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের দেহে সরীসৃপ বাসা নির্মাণ করেছে। অতঃপর তিনি কেঁদে বললেন ঃ আমার মনে হয়, তাদের কেউ আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পায়নি।

ছাবেত বানানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার এক কবরস্তানে গেলাম। যখন সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলাম, তখন কাউকে বলতে শুনলাম

ঃ হে ছাবেত, কবরবাসীদের নীরবতা দেখে ধোকা খেয়ো না। তাদের মধ্যে অনেকেই শোকার্ত।

আবু মূসা তামীমী (রহঃ) বলেন ঃ কবি ফারাযদাকের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জানাযার সাথে বসরার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি রওয়ানা হলেন। তাদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)ও ছিলেন। তিনি ফারাযদাককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি সে দিনের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছেন? সে বলল ঃ ষাট বছর ধরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তা সেদিনের জন্যেই।

সন্তান-সন্ততির ওফাত সম্পর্কে কথিত উক্তি ঃ যার পুত্র মারা যায়, সে একে মনে করবে, সে এবং তার পুত্র উভয়েই সফরে ছিল। তাদের গন্তব্যস্থল ছিল একটি শহর, যা সকলেরই প্রকৃত বাসস্থান। কিন্তু পুত্র সে বাসস্থানে প্রথমে চলে গেছে এবং সে-ও অচিরেই তার সাথে মিলিত হবে। এরূপ চিন্তা করলে বেশী অনুতাপ হবে না। কারণ, সে জানতে পারবে সে-ও কিছুদিনের মধ্যেই পুত্রের সাথে মিলিত হবে। এতে দুঃখ ও বেদনা কম হবে; বিশেষত তখন, যখন পুত্রের মৃত্যুর কারণে অপরিসীম ছওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— যদি আমি গর্ভপাতের সন্তান আগে পাঠিয়ে দেই, তবে সেটা আমার জন্যে একশ' অশ্বারোহী পিছনে ছেড়ে যাওয়ার চাইতে উত্তম, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে। নিম্নস্তর ও উচ্চস্তর বুঝানোর জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্ভপাতের সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় সওয়াব সে পরিমাণেই হয়, সন্তানের প্রতি অন্তরে যে পরিমাণ টান থাকে। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর এক পুত্র মারা গেলে তিনি তার জন্যে অত্যধিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, পুত্রের কদর আপনার কাছে কতটুকু ছিল? তিনি বললেন ঃ ভূ-পৃষ্ঠের সমান। অতঃপর তাকে বলা হল ঃ আখেরাতে আপনি ছওয়াবও এতটুকুই পাবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যদি কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে তাদের জন্যে সবর করে ছওয়াব প্রার্থী হয়, তবে সন্তানরা তার জন্যে দোযখ থেকে রক্ষার ঢাল হয়ে যাবে। কোন এক মহিলা আরয করল ঃ দু'জন মারা গেলেও কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দু'সন্তান মারা গেলেও।

পিতার উচিত মৃত্যুর সময় সন্তানের জন্যে দোয়া করা। কেননা, তার দোয়া অধিক আশাপ্রদ এবং কবুল হওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান নিজের পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে এরূপ দোয়া করেন— ইলাহী, আজ আমি তোমার কাছে তার জন্যে কল্যাণ আশা করি এবং তার

সম্পর্কে তোমাকে ভয় করি। অতএব, আমার আশা পূর্ণ কর এবং ভয় দূর কর।

আবু সিনান (রহঃ) তাঁর পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে এরূপ দোয়া করেন— এলাহী, আমার যে হক তার উপর ছিল, তা আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতএব, তোমার যে হক তার উপর ওয়াজেব ছিল, তা তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমি সর্বাধিক দাতা ও দয়ালু।

এক বেদুঈন তার পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইলাহী, সে আমার সাথে সদ্ব্যবহারে যে সকল ত্রুটি করেছে, তা আমি তাকে ক্ষমা করলাম। এখন তোমার আনুগত্যে সে যে সকল ত্রুটি করেছে, সেগুলো তুমি মার্জনা কর।

যুর ইবনে ওমরের ওফাত হলে তার পিতা ওমর পুত্রকে কবরে রাখার পর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে যুর, তোমার ব্যাপারে আমি এত বেশী শংকিত যে, তোমার জন্যে দুঃখ করাও ভুলে গেছি। জানি না, তোমাকে কি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তুমি কি জওয়াব দিয়েছ। অতঃপর বললেন ঃ ইলাহী, এ আমার পুত্র যুর। যতদিন তুমি ইচ্ছা করেছ, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছ। এখন তার আয়ু ও রূযী সমাপ্ত হয়েছে এবং তুমি তার প্রতি যুলুম করনি। ইলাহী, তুমি তার উপর তোমার ও আমার আনুগত্য অপরিহার্য করেছিলে। এ বিপদে সবর করার যে ছওয়াব তুমি আমাকে দিয়েছ, তা আমি তাকে দান করলাম। অতএব, তুমি তার আযাব আমাকে দিয়ে ফেল। তাকে আযাব দিয়ো না। একথা শুনে সকলেই কেঁদে ফেলল।

এক ব্যক্তি বসরায় এক মহিলাকে দেখে বলল ঃ এমন সজীবতা আমি কখনও দেখিনি। এর কারণ মনে হয়, তার দুঃখ কম। মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমি এমন দুঃখে জর্জরিত যাতে আমার কোন অংশীদার নেই। লোকটি বলল ঃ কিভাবে? মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী কোরবানীর ঈদের দিন একটি ছাগল যবেহ করেছিলেন। আমার ফুটফুটে ছেলে দু'টি অদূরেই খেলা করছিল। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বলল ঃ তুমি কি দেখতে চাও আমাদের পিতা কিভাবে ছাগল যবেহ করেছেন? সে বলল ঃ হাঁ। এরপর বড় ছেলে ছোট ছেলেকে ধরে যবেহ করে ফেলল। আমরা যখন খবর পেলাম, তখন ছেলে রক্তের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে বড় ছেলে দৌড়ে এক পাহাড়ে আত্মগোপন করতে চাইল। সেখানে ছিল এক বাঘ। সে ছেলেকে খেয়ে ফেলল। তার পিতা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে ভীষণ গরমে পিপাসায় কাতর হয়ে মারা গেল। এখন কালচক্র আমাকে একাই রেখে দিয়েছে।

মোটকথা, সন্তান মারা যাওয়ার সময় এ ধরনের বিপদাপদ স্মরণ করলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কেননা, এমন কোন বিপদ নেই, যার চেয়ে বড় বিপদ কল্পনা করা যায় না এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় যা দূর করেন না। অতএব হা-হুতাশ করা কিছুতেই উচিত নয়।

কবর যিয়ারত ঃ মৃত্যুকে স্মরণ ও শিক্ষা অর্জনের জন্যে যে কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। আর ওলী-আল্লাহগণের কবর যিয়ারত করা বরকত হাসিলের জন্যেও মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে এর অনুমতি দিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত কর। এটা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু সাবধান, কোন অযথা কথা সেখানে বলবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাজার সশস্ত্র ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে নিজের জননীর কবর যিয়ারত করেছেন। সেদিন যত মানুষকে কাঁদতে দেখা গেছে, এর চেয়ে বেশী কখনও দেখা যায়নি। সেদিনই তিনি এরশাদ করেন— আমি কেবল যিয়ারত করার অনুমতি পেয়েছি— মাগফেরাতের দোয়া করার নয়। ইবনে আবী মুশায়কা (রহঃ) বলেন ঃ একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কবরস্তান থেকে ফিরে এলে আমি আরয করলাম ঃ আপনি কোত্থেকে এলেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভাই আবদুর রহমানের কবর থেকে। আমি আরয করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রথম দিকে নিষেধ করেছিলেন, এরপর অনুমতি দিয়েছেন।

এই রেওয়ায়েত দৃষ্টে মহিলাদেরকে কবরস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। কেননা, তারা কবরস্তানে গিয়ে অনেক অশোভন কথাবার্তা বলে ফেলে। ফলে, কবর যিয়ারতে যে ছওয়াব হয়, গোনাহ তার চেয়ে বেশী হয়। এ ছাড়া পথে পর্দার খেলাফ করা এবং বেগানা পুরুষদের সামনে সাজসজ্জাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এগুলো কবীরা গোনাহ। আর কবর যিয়ারত করা কেবল সুন্নত। অতএব, সুন্নত আদায় করার জন্য এমন গোনাহ করা কিরূপে বৈধ হবে? অবশ্য যদি মহিলারা ছেঁড়া ও জীর্ণ বস্ত্র পরে বের হয় এবং কবরে গিয়ে দোয়া ছাড়া অন্য কিছু না বলে, তবে কোন দোষ নেই।

হযরত আবু যর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কবর যিয়ারতের মাধ্যমে তোমরা আখেরাতকে স্মরণ কর এবং মৃতদেরকে গোসল দাও। কেননা, আত্মাহীন শরীরের তদবীর করা একটি বড় উপদেশ।

আর জানাযার নামায পড়। এতে আশা করা যায়, দুঃখ অর্জিত হবে। দুঃখিত মানুষ আল্লাহ তা'আলার ছায়ায় থাকে।

ইবনে আবী মুশায়কার রেওয়ায়েতে আছে— মৃতদের যিয়ারত কর, তাদেরকে সালাম কর এবং তাদের জন্যে দোয়া কর। এতে তোমাদের শিক্ষা অর্জিত হবে।

হযরত নাফে' বর্ণনা করেন— হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যে কবরের কাছ দিয়ে গমন করতেন, সেখানে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন— হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ) তাঁর পিতৃব্য হযরত হামযার কবর যিয়ারতের জন্যে কয়েক দিন পরপর গমন করতেন, কবরের কাছে নামায পড়তেন ও কাঁদতেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি প্রতি জুমআর দিনে নিজের পিতার অথবা যে কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করে, তার গোনাহ মার্জনা করা হয় এবং ছওয়াব লেখা হয়।

হযরত ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য কোন ব্যক্তি যদি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্যে দোয়া করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এক হাদীসে আছে— من زارقبرى وجبت له شفاعتى

অর্থাৎ, যে আমার কবর যিয়ারত করে, আমার শাফায়াত তার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে।

হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) বলেন ঃ যখন ফজর উদিত হয়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কবর শরীফকে আচ্ছন্ন করে নেয় এবং পাখা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে। সন্ধ্যা হলে এসব ফেরেশতা আকাশে চলে যায় এবং এ পরিমাণ অন্য ফেরেশতা নেমে আসে। তারাও তাই করে, যা পূর্ববর্তীরা করেছিল। এ ধারা ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্থিত হবেন এবং তাঁর সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর তাযীম করতে থাকবে।

কবর যিয়ারতে মুস্তাহাব হল, কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃতের প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো এবং মৃতের উদ্দেশে সালাম করা। কবরকে না মোছা, হাত না লাগানো এবং চুম্বন না করা। এসব কাজ খৃস্টানদের রীতি। হযরত

নাফে' বলেন ঃ আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে একশ' বার বরং আরও বেশী বার দেখেছি, তিনি পবিত্র রওযার কাছে এসে বলতেন— সালাম নবী (আঃ)-এর প্রতি সালাম, আবু বকরের প্রতি সালাম এবং আমার পিতার প্রতি সালাম। এরপর তিনি ফিরে আসতেন।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন ঃ আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে দেখেছি— তিনি কবর শরীফের কাছে এলেন, দাঁড়ালেন এবং উভয় হাত উপরে তুললেন। এমনকি, আমার ধারণা হল তিনি নামাযের জন্যে আল্লাহু আকবার বললেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সালাম বলে ফিরে গেলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে, তার কাছ থেকে সে (মৃত ভাই) প্রীতি অর্জন করে যে পর্যন্ত সে সেখানে বসে থাকে এবং তার সালামের জওয়াব দেয়।

সোলায়মান ইবনে সহীম (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরয করলাম— ইয়া রসূলাল্লাহ, মানুষ আপনার কাছে উপস্থিত হয় এবং আপনার প্রতি সালাম করে। আপনি তাদের সালাম বুঝেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, বুঝি এবং তাদের সালামের জওয়াব দেই।

আসেম হজদরীর বংশধরদের একজন বললেন ঃ মৃত্যুর দু'বছর পর আমি আসেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি তো মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি বললেন ঃ আমরা জান্নাতের একটি বাগানে থাকি। আমরা আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ প্রতি জুমআর রাতে ও ভোরে আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযনী (রহঃ)-এর কাছে সমবেত হয়ে তোমাদের খবরাখবর শুনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনাদের দেহ একত্রিত হয়, না রূহ? তিনি বললেন ঃ দেহের নয়— আত্মার মোলাকাত হয়। আমি বললাম ঃ আমাদের যিয়ারত সম্পর্কে আপনারা অবগত হন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, জুমআর রাতে পরবর্তী দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমাদের যিয়ারতের খবর পাই। আমি বললাম ঃ অন্য দিনগুলোতে খবর পান না কেন? তিনি বললেন ঃ জুমআর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এতে অবগতি হয়।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে জুমআর দিন কবর যিয়ারত করতেন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি রবিবার পর্যন্ত যিয়ারত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি মৃতরা তাদের যিয়ারতকারীদেরকে জুমআর দিন, তার একদিন আগে এবং একদিন পরে পর্যন্ত চিনতে পারে।

বাশশার ইবনে গালেব নাজরানী বলেন ঃ আমি রাবেআ বসরীয়ার জন্যে অনেক দোয়া করতাম। এক রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ হে বাশশার, তোমার উপঢৌকন আমার কাছে উপর্যুপরি নূরের আলোয় রেশমী রুমালে বাঁধা অবস্থায় আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এগুলো এভাবে আসে কেন? তিনি বললেন ঃ যে মুসলমান মৃত বন্ধু-বান্ধবের জন্যে দোয়া করে এবং দোয়া কবুল হয়ে যায়, তার দোয়া এমনিভাবে নূরের আলোয় রেখে রেশমী রুমাল দিয়ে বেঁধে মৃতকে দিয়ে বলা হয়, এটা তোমার জন্যে অমুকের উপঢৌকন।

হাদীস শরীফে আছে— মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ফরিয়াদকারীর অনুরূপ। সে পিতা, ভাই অথবা বন্ধুর পক্ষ থেকে দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন কারও পক্ষ থেকে দোয়া পৌঁছে, তখন এটা তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়।

কবরের কাছে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মরুযী বলেন ঃ আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি— যখন তুমি কবরস্তানে যাবে, তখন সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা এখলাস পাঠ করে তার ছওয়াব কবরবাসীদেরকে বখশে দেবে। তারা তা পেয়ে যাবে। সুতরাং যিয়ারতকারী নিজের জন্যে এবং মৃতের জন্যে দোয়া করার ব্যাপারে গাফেল হবে না।

মৃত্যুর স্বরূপ ঃ মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নানা রকম ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণা প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কোন কোন লোক মনে করে মৃত্যু হচ্ছে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। এর সাথে না হাশর আছে, না পুনরুত্থান এবং না ভাল-মন্দ পরিণাম। মানুষের মৃত্যু জন্তু-জানোয়ার ও ঘাসের মৃত্যুর মতই। এ মত তাদের, যারা মুলহিদ তথা ধর্মদ্রোহী এবং আল্লাহ ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। কারও কারও ধারণা, মৃত্যুর কারণে মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়; কিন্তু কবর থেকে হাশর পর্যন্ত না কোন আযাবের কষ্ট অনুভব করে, না ছওয়াবের সুখ। কেউ কেউ বলে আত্মা অবশিষ্ট থাকে— মৃত্যুর কারণে অস্তিত্বহীন হয় না এবং ছওয়াব ও আযাব হয় আত্মার— দেহের নয়। দেহ কখনও উত্থিত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হবে না। এ সমস্ত উক্তি সত্যবিমুখ ও ভ্রান্ত। কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মৃত্যু কেবল অবস্থা পরিবর্তনের নাম। আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হয় আযাবে থাকে, না হয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে থাকে। দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ দেহের উপর তার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাওয়া এবং দেহ তার আনুগত্য থেকে

মুক্ত হয়ে যাওয়া। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আত্মার হাতিয়ার। আত্মা এগুলোকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। উদাহরণতঃ হাত দ্বারা সে ধরে, কান দ্বারা শুনে এবং চোখের দ্বারা দেখে। কিন্তু বস্তুনিচয়ের স্বরূপ আত্মা নিজেই জেনে নেয়। এজন্যে কোন হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে বিভিন্ন দুঃখজনক ঘটনায় সে নিজেই দুঃখ পায় এবং সুখের ঘটনায় নিজেই সুখ অনুভব করে। এ ধরনের যেসকল বিষয়ের সাথে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক নেই, সেগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও আত্মার সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। আর আত্মা যেসকল বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অর্জন করে, সেগুলো দেহ মরে যাওয়ার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি, কবরে আত্মার পুনরায় দেহের মধ্যে আগমন এবং এ আগমন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

মৃত্যুর কারণে দেহের বেকার হয়ে যাওয়া অর্ধাঙ্গ রোগীর অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া এবং তাতে আত্মার নিষ্ক্রিয়তার অনুরূপ। এমতাবস্থায় আত্মার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে এবং সে কোন কোন অঙ্গকে কাজে লাগায় ও কোন কোন অঙ্গ অবাধ্য হয়ে যায়। মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, সকল অঙ্গের নাফরমান হয়ে যাওয়া। এভাবে মৃত্যুর কারণে দেহের উপর আত্মার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায় এবং তার জ্ঞান, চেতনা, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ ইত্যাদি অব্যাহত থাকে।

মৃত্যুর কারণে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন দু'ভাবে হয়ে থাকে। এক, মানুষ তথা আত্মার কাছ থেকে চোখ-কান-হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পরিবার, স্ত্রী-পুত্র, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়া। মানুষের কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেয়া অথবা মানুষকে এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া— এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কেননা, যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হচ্ছে বিচ্ছেদ। উভয় অবস্থায় এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সমান। কখনও মানুষের ধন-সম্পদ লুটে নেয়া হয় এবং কখনও ধন-সম্পদ ঠিক জায়গায় থাকে, কিন্তু তার মালিককেই বন্দী করে নেয়া হয়। উভয় অবস্থায় যন্ত্রণা একই রূপ থাকে। মৃত্যুও তাই; অর্থাৎ মানুষকে তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও বিষয়-আশয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা এ জগতের অনুরূপ নয়। সুতরাং এ জগতে তার কোন সখের বস্তু থেকে থাকলে মৃত্যুর পর তার বিরহে সে নেহায়েত কষ্ট ভোগ করবে। পরজগতে থেকে সে ইহজগতের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করবে। এমনকি,

ইহজগতে সে কোন জামা পরিধান করে আনন্দিত হয়ে থাকলে তা হাতছাড়া হওয়ার কষ্টও সে অনুভব করবে। আর যদি সে ইহজগতে কেবল আল্লাহর যিকিরেই তৃপ্তি পেত, তবে মৃত্যুর কারণে অত্যন্ত সুখ ও স্বস্তি পাবে। কেননা, তখন বাধাসমূহ অপসারিত হয়ে যাবে এবং প্রিয়জন ও নিজের মধ্যে কোন অন্তরায় থাকবে না।

দ্বিতীয় পরিবর্তন হল, মৃত্যুর কারণে মানুষের সামনে এমনসব বিষয় উদঘাটিত হয়ে পড়া, যা জীবদ্দশায় উদঘাটিত হত না। যেমন— জাগ্রত মানুষের সামনে সে সব অবস্থা ফুটে উঠে না, যা স্বপ্নে ফুটে উঠে। মানুষ মাত্রই ঘুমন্ত। যখন মরবে, তখনই জাগ্রত হবে।

মৃত্যুর পর মানুষের সামনে যে অবস্থাটি সর্বপ্রথম ফুটে উঠবে, তা হল তার সৎকর্মের লাভ ও অসৎকর্মের ক্ষতি। অথচ এ অবস্থাটি তার অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থিত খাতায় লিখিত ছিল। কিন্তু দুনিয়ার ঝামেলার কারণে এর খবর ছিল না। যখন দুনিয়ার ঝামেলা থাকল না, তখন সমস্ত আমল তার কাছে ফুটে উঠল। এখন সে নিজের কুকর্ম দেখে এত অনুতাপ করে যে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তখন তাকে বলা হয়—

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

অর্থাৎ— নিজের হিসাব নেয়ার জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি প্রয়োজন অনুপাতে দুনিয়া অন্বেষণ করে, মৃত্যুর পর তার কোন বিরহ-যন্ত্রণা হয় না; বরং সে মনযিলে পৌঁছে আনন্দিত হয়। কেননা, মনযিলে পৌঁছাই তার উদ্দেশ্য ছিল— পাথেয় উদ্দেশ্য ছিল না।

অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর কারণে আত্মা অস্তিত্বহীন হয় না এবং তার উপলব্ধিও বিলুপ্ত হয় না। আল্লাহ তা'আলা শহীদদের সম্পর্কে এরশাদ করেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ -

অর্থাৎ— যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদের পালনকর্তার কাছে রিযিকপ্রাপ্ত ও প্রফুল্ল।

বদর যুদ্ধে অনেক কোরায়শ সরদার নিহত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকেন এবং বলেন ঃ হে অমুক, হে অমুক, আমার পালনকর্তা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। তোমাদের সাথে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে ওয়াদা করেছিলেন, তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কিনা? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন? তারা শুনবে কি? তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, তারা আমার কথা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনে। কিন্তু জওয়াব দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এ হাদীসটি হতভাগ্য আত্মার কায়েম থাকা, তার উপলব্ধি ও মারেফত বহাল থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। পূর্বোক্ত আয়াতটি প্রমাণ ছিল শহীদদের আত্মার ব্যাপারে। বলা বাহুল্য, মৃত দু'ধরনের— হতভাগ্য ও ভাগ্যবান।

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ কবর জাহান্নামের একটি গহ্বর অথবা জান্নাতের একটি উদ্যান। মৃত্যুর অর্থ যে কেবল অবস্থার পরিবর্তন, এ হাদীসটি তার সুস্পষ্ট দলীল। এ থেকে আরও বুঝা যায়, মৃতের জন্যে যে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অবধারিত থাকে, তা মৃত্যুর পরেই অবিলম্বে শুরু হয়ে যায়। তবে কোন কোন রকম আযাব ও ছওয়াব পরে হবে। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الموت قيامة فمن مات فقد قامت قيامته

অর্থাৎ, মৃত্যু হল একটি কিয়ামত। যার মৃত্যু হয়, তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

এক হাদীসে আছে— যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার ঠিকানা সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে পেশ করা হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাতে এবং দোযখী হলে দোযখে তার ঠিকানা দেখানো হয় এবং বলা হয়, এটা তোমার ঠিকানা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এতেই পৌঁছাবেন। তখন এসব ঠিকানা দেখে যে আনন্দ বা কষ্ট হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি দোযখীদের, তা না জানা পর্যন্ত কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من مات غريبا مات شهيدا ووقى فتانى القبر وغدى وريح عليه رزقه من الجنة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। তাকে কবরের দু'ফেতনা সৃষ্টিকারী ফেরেশতা থেকে বাঁচানো হয় এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার রিযিক জান্নাত থেকে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-কে বললেন ঃ (তার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাই? জাবের বললেন ঃ খুব ভাল কথা! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করে নিজের সামনে বসিয়ে বলেছেন, হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা আমার কাছে আশা কর, আমি তোমাকে দেব। তোমার পিতা আরয করল ঃ এলাহী, আমি তোমার এবাদত যথার্থরূপে করিনি। আমি আশা করি, তুমি আবার আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও, যাতে তোমার রসূলের পতাকাতলে যুদ্ধ করি এবং পুনরায় তোমার পথে মারা যাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি দুনিয়াতে ফিরে যাবে না, এটা পূর্বেই আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ যে ব্যক্তি মারা যায়, সে তার বাড়ীতে যা কিছু হয় সবই জানে। এমনকি, যখন তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হল, সে তাও জানে। মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন— আমি শুনেছি, মুমিনদের রূহ মুক্ত বিহঙ্গের মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা মন্দ কর্মের দ্বারা তোমাদের মৃতদেরকে লজ্জিত করো না। কেননা, তোমাদের কুকর্ম তোমাদের মৃত বন্ধুদের সামনে পেশ করা হয়। একারণেই হযরত আবুদারদা দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন— ইলাহী, আমি তোমার কাছে এমন কর্ম থেকে আশ্রয় চাই, যার কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে লজ্জিত হব। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আবুদারদার মামা ছিলেন এবং তাঁর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ কোথায় থাকে? তিনি বললেন ঃ সাদা পাখির আকারে আরশের ছায়ায় থাকে। আর কাফেরদের রূহ ভূ-গর্ভের সপ্তম স্তরে থাকে।

ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন ঃ কবরবাসীরা খবরের অপেক্ষায় থাকে। কোন মৃত তাদের কাছে গেলে তারা বলে, অমুক ব্যক্তি কেমন? মৃত বলে, সে তো দুনিয়া থেকে চলে এসেছে। তোমাদের কাছে আসেনি? তারা বলে, না। এরপর বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাকে হয়তো অন্য কোন পথে নিয়ে গেছে। আমাদের কাছে আসেনি।

কবরের অবস্থা ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে বলে ঃ হে উজাড়-গৃহ ব্যক্তি, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে কিসে ধোকায় ফেলে রাখল? তুমি কি জান না, আমি পরীক্ষাগার, অন্ধকারের ঠিকানা, একাকীত্বের নিবাস এবং কীটের আবাসভূমি? আমার সম্পর্কে তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করেছিল যে, তুমি আমার উপর বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতে? মৃত সাধু ব্যক্তি হলে তার পক্ষ থেকে কেউ জওয়াব দেয়— হে কবর, তুমি দেখ না, এ ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ করত এবং অসৎ কাজে নিষেধ করত? কবর বলে— তাহলে এখন আমি তার জন্য সবুজ হয়ে যাব, তার দেহ নূর হয়ে যাবে এবং আত্মা আল্লাহ তা'আলার কাছে চলে যাবে।

এয়াযীদ রাক্কাসী বলেন ঃ আমি শুনেছি, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ তাকে বলেন ঃ হে গর্তে পতিত একাকী বান্দা, তোমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজন তোমার কাছ থেকে চলে গেছে। আমার কাছে আজ তোমার কোন সহচর নেই।

হযরত কা'বে আহবার বলেন ঃ যখন নেক বান্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জেহাদ ইত্যাদি সৎ কাজসমূহ এসে তাকে ঘিরে রাখে। আযাবের ফেরেশতা যখন তার পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে, দূরে থাক। এ ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে এ পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকত। এরপর ফেরেশতা মাথার দিক দিয়ে আসে। তখন রোযা বলে, এদিকে তোমার পথ নেই। এ ব্যক্তি দুনিয়াতে অনেক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকত। ফেরেশতা দেহের দিক দিয়ে আসতে চাইলে হজ্জ ও জেহাদ বলে, এদিক থেকে দূরে থাক। সে এ দেহ দিয়ে হজ্জের জন্য অনেক শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে। ফেরেশতা হাতের দিক দিয়ে আসতে চাইলে তার সদকা ও দান-খয়রাত বলে, এ নেক ব্যক্তিকে আযাব থেকে মুক্ত রাখ। সে এ হাত দিয়ে অনেক দান-খয়রাত করেছে, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়েছে। অতএব, তুমি এদিক দিয়ে পথ পাবে না। তখন এই মৃতকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলা হয়— তুমি পবিত্র হয়েই জীবন যাপন করেছ এবং পবিত্র হয়েই

মৃত্যুবরণ করেছ। এরপর তার কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে এবং তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পাতে। তার জন্যে জান্নাতী পোশাক আনা হয় এবং যতদূর দৃষ্টি যায়, তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। জান্নাত থেকে একটি প্রদীপ এসে যায়, যার আলোকে সে পুনরুত্থান পর্যন্ত অবস্থান করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দ ইবনে ওমায়র এক জানাযার সাথে চলার সময় বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— মৃতকে কবরে বসানো হয় এবং সে জানাযায় উপস্থিত লোকদের পায়ের শব্দ শুনে। তখন কবর ছাড়া কেউ তার সাথে কথা বলে না। কবর বলে ঃ হে উজাড়-গৃহ ব্যক্তি, আমার সম্পর্কে কেউ কি তোমাকে সতর্ক করেনি? আমি যে সংকীর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, ভয়াবহ ও কীটে পরিপূর্ণ, একথা কি তোমাকে কেউ বলেনি? অতএব, তুমি আমার জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?

কবরের আযাব ও মুনকির-নকীরের সওয়াল ঃ হযরত বারা' ইবনে আযেব বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে জনৈক আনসারীর জানাযায় গেলাম। তিনি কবরের উপরে মাথা নীচু করে তিনবার বললেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যখন ঈমানদার আখেরাতে উপস্থিতির পর্যায়ে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা এমন ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে দেন, যাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মত উজ্জ্বল। তাদের সাথে ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে সুগন্ধি ও কাফন থাকে। তারা তার দৃষ্টির সামনে বসে। যখন তার রূহ নির্গত হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে যায়। প্রত্যেক দরজা চায়, মুমিনের রূহ তার ভিতর দিয়ে গমন করুক। মুমিনের রূহ যখন উপরে আরোহণ করে, তখন ফেরেশতারা আরয করে— ইলাহী, সে তোমার অমুক বান্দা। আদেশ হয়, তাকে নিয়ে যাও এবং তার সম্মানের জন্য আমি যা কিছু প্রস্তুত করেছি, তা তাকে দেখিয়ে দাও। কারণ, আমি ওয়াদা করেছি—

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى -

অর্থাৎ, এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এ মাটি থেকেই পুনরায় উত্থিত করব।।

এভাবে রূহ কবরে ফিরে আসে এবং সে প্রত্যাগত লোকদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে তাকে প্রশ্ন করা হয়— তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? মুমিন জওয়াব দেয়— আমার রব আল্লাহ। আমার দ্বীন ইসলাম। আমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। এ জওয়াবের পর এক ঘোষক ঘোষণা করে— তুমি সত্য বলেছ। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মযবুত কথা দ্বারা পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে মযবুত রাখেন।

এরপর তার কাছে একজন সুবেশী ও সুগন্ধযুক্ত আগন্তুক এসে বলে— তোমার জন্যে পরওয়ারদেগারের রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ, যাতে চিরস্থায়ী আনন্দ রয়েছে। মুমিন বলে— তোমার জন্যেও কল্যাণের সুসংবাদ হোক, তুমি কে? আগন্তুক বলে— আমি তোমার নেক আমল। আমি তোমার অবস্থা জানি। তুমি আল্লাহ তা'আলার এবাদতে দ্রুত ধাবিত হতে এবং গোনাহের কাজে বিলম্ব করতে। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে— এ মুমিনের জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও এবং এদিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। শয্যা পাতা এবং জান্নাতের দরজা খোলা হলে মুমিন বলে— ইলাহী, কিয়ামত অবিলম্বে কায়েম কর, যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফের যখন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখেরাতের সম্মুখীন হয়, তখন দু'জন রুক্ষ মেযাজের ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের সাথে থাকে আগুনের পোশাক ও গন্ধকের জামা। তারা তার আশে-পাশে অবস্থান নেয়। যখন আত্মা নির্গত হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতা তার প্রতি অভিসম্পাত করে এবং আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেকটি দরজাই তার ভেতর দিয়ে এ আত্মার গমনকে অশুভ মনে করে। তার আত্মা যখন উপরে আরোহণ করে, তখন তাকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়। ফেরেশতারা আরয করে, ইলাহী, তোমার এ বান্দাকে আকাশও কবুল করল না এবং পৃথিবীও না। আল্লাহ বলেন ঃ তাকে

সরিয়ে নিয়ে যাও এবং আযাবের যে সরঞ্জাম আমি তার জন্যে তৈরী করেছি, তা দেখিয়ে দাও। আমি তার কাছে مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ الخ এর ওয়াদা করেছি। এভাবে কবরে আসার পর সে প্রত্যাগতদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে তাকে বলা হয়, তোমার রব কে? নবী কে? দ্বীন কি? সে জওয়াব দেয়— আমি জানি না। এরপর তার কাছে এক কুশ্রী, দুর্গন্ধযুক্ত ও কুবেশী আগন্তুক এসে বলে, তোমাকে আল্লাহর গযব এবং যন্ত্রণাদায়ক ও স্থায়ী আযাবের দুঃসংবাদ। সে বলে— আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গলের সংবাদ দিন, তুমি কে? আগন্তুক বলে— আমি তোমার বদ আমল। তুমি আল্লাহর নাফরমানিতে দ্রুতগামী এবং এবাদতে বিলম্বকারী ছিলে। আল্লাহ তোমাকে কুপ্রতিদান দিন। সে বলে, তোমাকেও কুপ্রতিদান দিন। এরপর তার উপর এক বধির ও বোবাকে নিয়োগ করা হয়, যার কাছে থাকে লোহার গদা। যদি জিন ও মানব সেটাকে তুলতে চায়, তুলতে পারে না। এই গদা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলে পাহাড় মাটি হয়ে যায়। এই বধির ও বোবা কাফেরকে আঘাত করলে সে মাটি হয়ে যায়। পুনর্বার তাতে প্রাণ ফিরে আসে। অতঃপর তার চোখের মাঝখানে এক আঘাত করে। তার চীৎকার জিন ও মানব ছাড়া পৃথিবীবাসী সকলেই শুনে। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে— এই কাফেরের জন্যে দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও এবং একটি দরজা দোযখের দিকে খুলে দাও। সেমতে তার জন্যে দু'টি তক্তা বিছিয়ে দেয়া হয় এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর সময় মৃতের নেক ও বদ আমলসমূহ আকৃতি ধারণ করে তার সামনে আসে। সে নেক আমলগুলোকে দেখে এবং বদ আমলগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন মুমিন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন ফেরেশতা তার কাছে রেশমী বস্ত্রে করে মেশক ও রায়হানের মাটি নিয়ে আসে। অতঃপর তার আত্মা এত সহজে বের করে, যেমন আটার মধ্য থেকে চুল বের করে নেয়া হয়। ফেরেশতা বলে— হে প্রশান্ত নফস, আল্লাহর সম্মান ও সুখের দিকে বের হয়ে এস। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আত্মা বের হওয়ার পর সেটাকে মেশক ও রায়হানের মধ্যে রেখে উপরে রেশমী বস্ত্র জড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর ইল্লিয়্যীন অর্থাৎ, ঊর্ধ্বে বসবাসকারীদের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

অপরপক্ষে কাফেরের যখন মৃত্যু আসে, তখন তার কাছে ফেরেশতারা চটের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তার প্রাণ বের করে। বলা হয়— হে অপবিত্র প্রাণ, আল্লাহর আযাব ও লাঞ্ছনার দিকে বের হয়ে আয়। তুই তাঁর প্রতি রুষ্ট এবং তিনি তোর প্রতি ক্রুদ্ধ। এরপর প্রাণ বের হলে সেটাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। তাতে সে ছটফট করতে থাকে। অতঃপর উপর দিয়ে চট জড়িয়ে সিজ্জীন তথা কয়েদখানায় পাঠানো হয়।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— মুমিনের কবরে একটি সবুজ বাগান থাকে। তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণিমার রাতের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল হয়।

তোমরা জান, এ আয়াতের মর্ম কি? فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا অর্থাৎ, নিশ্চয় তার জন্যে সংকীর্ণ জীবন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে কবরে কাফেরের আযাব। তার উপর নিরানব্বইটি "তিন্নীন" ছেড়ে দেয়া হবে। তোমরা জান তিন্নীন কি? এগুলো হচ্ছে— অজগর। এদের প্রত্যেকের সাতটি করে ফণা হবে। এগুলো কাফেরের দেহকে কিয়ামত পর্যন্ত পিষ্ট ও নিষ্পেষিত করতে থাকবে।

হাদীসে উল্লিখিত নিরানব্বই সংখ্যাটি দেখে বিস্মিত না হওয়া উচিত। কারণ, সর্প ও বিচ্ছুর সংখ্যা মন্দ চরিত্র তথা অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদির সংখ্যা অনুসারে হবে। কেননা, এগুলোর মূল গুণাগুণ কয়েকটি মাত্র। অতঃপর এসব মূল থেকে কতিপয় শাখা নির্গত হয়েছে এবং শাখাসমূহও কয়েক প্রকারে বিভক্ত হয়েছে। নিজের সত্তার দিক দিয়ে সব প্রকারই মারাত্মক। এগুলোই স্বয়ং সাপ ও বিচ্ছুতে পরিণত হবে। তবে যে স্বভাবটি যবরদস্ত হবে, সেটি অজগরের ন্যায় দংশন করবে এবং যে স্বভাবটি দুর্বল হবে, সেটি বিচ্ছুর ন্যায় হুল মারবে। আর মাঝারি স্বভাবটি সাপের ন্যায় যন্ত্রণা দেবে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বুযুর্গগণ এসব মন্দ স্বভাবের ধ্বংসকারিতা ও এদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্তিকে নূরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেন। তবে এদের সংখ্যা নবুওয়তের নূর ছাড়া অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না।

মোটকথা, এ ধরনের হাদীসের বাহ্যিক অর্থ সঠিক এবং এতে অনেক রহস্য লুক্কায়িত, যা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের কাছে সুস্পষ্ট। সুতরাং কারও কাছে

এগুলোর স্বরূপ উদঘাটিত না হলে বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা মোটেই উচিত নয়। বরং বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াই কর্তব্য।

প্রশ্ন হয়, এটা অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। কেননা, আমরা কাফেরকে কবরে দীর্ঘ দিন দেখি; কিন্তু এসব সাপ-বিচ্ছু কখনও দেখা যায় না। সুতরাং অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বিশ্বাস স্থাপন করা কিরূপে সম্ভব? জওয়াব এই যে, এধরনের বিষয়কে তিন ভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়।

প্রথমত, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং মৃত কাফেরকে দংশন করে। কিন্তু এ কারণে আমরা তা জানি না যে, এগুলো দেখার যোগ্যতা আমাদের চর্মচক্ষে নেই। আখেরাত সম্পর্কিত এসব ব্যাপার বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সাহাবায়ে কেরাম হযরত জিবরাঈলের অবতরণে বিশ্বাস করতেন। অথচ তাঁকে দেখতেন না। তারা একথাও বিশ্বাস করতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে দেখেন। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে প্রথমে ফেরেশতা ও ওহীর প্রতি বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা অপরিহার্য। নবী এক বিষয় দেখতে পারেন, যা তাঁর উম্মত দেখতে পারে না— এটা বিশ্বাস্য ও সম্ভবপর হলে মৃতের বেলায় কেন সম্ভবপর হবে না? ফেরেশতা যেমন দুনিয়ার মানুষের অনুরূপ নয়, তেমনি কবরের সাপ-বিচ্ছুও দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর মত নয়। তাদের প্রজাতি ভিন্ন এবং যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাদেরকে জানা যায়, তাও ভিন্ন।

দ্বিতীয়ত, তুমি নিদ্রিত ব্যক্তির অবস্থা দেখ। সে কখনও স্বপ্নে দেখে, তাকে বিচ্ছু ও সাপ দংশন করছে। এতে তার ব্যথাও এমন হয় যাতে মাঝে মাঝে নিদ্রার মধ্যেই সে চীৎকার করে উঠে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায় এবং কখনও নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে। নিদ্রিত ব্যক্তি এসব জানতে পারে এবং ব্যথা তেমনি পায়, যেমন জাগ্রত ব্যক্তি পায়। অথচ মনে হয় না, সে নড়াচড়া করছে এবং তার আশেপাশে কোন সাপ-বিচ্ছুও দেখা যায় না। কিন্তু তার বেলায় সাপও থাকে এবং কষ্টও। অবশ্য সেটা তোমার প্রত্যক্ষণের বাইরে। অতএব, যে ক্ষেত্রে দংশনের কষ্ট অর্জিত, সেখানে সাপের কাল্পনিকতা অথবা চোখে দেখা উভয়টিই সমান।

তৃতীয়ত, তুমি জান, সাপ নিজে কষ্ট দেয় না বরং কষ্ট এর বিষের মাধ্যমে হয়। এরপর বিষও ব্যথা নয়; বরং তোমার মধ্যে বিষের যে প্রভাব হয়, কষ্ট তা থেকেই অনুভূত হয়। সুতরাং যদি বিষ ছাড়াই এমনি প্রভাব দেহের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে কষ্ট প্রচুর হবে। কিন্তু এই কষ্ট এছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যক্ত করা যায় না যে, যে কারণে এরূপ কষ্ট হওয়ার নিয়ম প্রচলিত, সেই কারণের প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করে দেয়া। উদাহরণতঃ যদি

মানুষের মধ্যে বাহ্যত কোন নারীর সাথে সহবাস ছাড়াই সহবাসের আনন্দ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এই আনন্দকে কিভাবে ব্যক্ত করবে? একথাই বলবে যে, এটা সহবাসের আনন্দ। এই সম্বন্ধের মাধ্যমে কারণ শনাক্ত হয়ে যাবে এবং তার ফল জানা হয়ে যাবে, যদিও দৃশ্যত কারণ উপস্থিত নয়। ফলাফলের জন্যেই তো কারণ তালাশ করা হয়। কারণের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হয় না। মৃত্যুর সময় মানুষের বদ-স্বভাবসমূহ কষ্টদায়ক হয়ে যায় এবং সে কষ্ট সাপ ও বিচ্ছুর কষ্টের অনুরূপ হয়। সাপ ও বিচ্ছু সেখানে থাকে না। বদ-স্বভাবের কষ্টদায়ক হয়ে যাওয়া এমন, যেমন মাশুকের মৃত্যুর পর ইশক আশেকের জন্যে কষ্টদায়ক হয়ে যায়। অর্থাৎ, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, পূর্বে যা ছিল আনন্দদায়ক, তা এখন কষ্টদায়ক হয়ে যায়। ফলে, মনের উপর এমন আযাব হতে থাকে, যাতে আশেক কামনা করতে থাকে যে, এই ইশক ও মিলন না হলেই ভাল হত! মৃতের আযাবের অবস্থাও হুবহু তেমনি। দুনিয়াতে সে মোহগ্রস্ত হয়ে ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের সাথে ইশক করতে থাকে! যদি জীবদ্দশায় এগুলো কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায় এবং ফেরত পাওয়ার আশা না থাকে, তবে দেখা যায়, তার কি শোচনীয় অবস্থা হয়! সে বাসনা করতে থাকে, এগুলো আমার হাতে কোনদিন না এলেই ভাল হত। আজ এহেন দুর্দিনের মুখ দেখতে হত না এবং হারানোর ব্যথা সইতে হত না। মৃত্যুতেও তাই হয়। অর্থাৎ, যাবতীয় পার্থিব প্রিয়বস্তু একযোগে হাতছাড়া হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? জওয়াব এই যে, কতক লোক প্রথম উপায়ের প্রবক্তা। তাদের মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় স্বীকার্য নয়। কেউ কেউ প্রথমটি অস্বীকার করে ও দ্বিতীয়টি মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ শুধু তৃতীয়টি স্বীকার করে। বাস্তব সত্য এই যে, তিনটি উপায়ই সম্ভব। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা তাই জানতে সক্ষম হয়েছি। মনোবলের সংকীর্ণতার কারণেই কেউ কেউ কতক উপায়কে অস্বীকার করে। তারা আল্লাহ তা'আলার যে সকল ক্রিয়াকর্মের সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত নয়, সেগুলোকেই অস্বীকার করে বসে। বান্দাকে আযাব দেয়ার এই উপায়ত্রয়কেই সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে একভাবে এবং কোন বান্দাকে অন্যভাবে আযাব দেন। কতক বান্দা এমনও থাকে, যাদেরকে তিন প্রকারেই আযাব দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কম ও বেশী আযাব থেকে নিজের আশ্রয়ে রাখুন।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— মৃত্যুর পর মানুষের কাছে দু'জন কৃষ্ণবর্ণ, নীল চক্ষুবিশিষ্ট ফেরেশতা আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নকীর। তারা মৃতকে জিজ্ঞেস করে, নবী সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য ছিল? মৃত ঈমানদার হলে জওয়াব দেয়, আমি তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বলতাম। উভয় ফেরেশতা বলে— আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম, তুমি একথা বলবে। এরপর তার কবর সত্তর গজ দৈর্ঘ ও সত্তর গজ প্রস্থ করে দেয়া হয়। কবরকে আলোকোজ্জ্বল করা হয় এবং মৃতকে বলা হয়— ঘুমিয়ে পড়। সে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজের পরিজনের মধ্যে গিয়ে তাদেরকে অবস্থা বলে আসি। তাকে বলা হয়— তুমি ঘুমিয়ে পড়। সেমতে সে নববধূর মত ঘুমিয়ে পড়ে, যাকে তার সর্বাধিক প্রিয়জনই জাগ্রত করে। এই মুমিনকেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাই জাগ্রত করবেন।

পক্ষান্তরে যদি মৃত মুনাফিক হয়, তবে জওয়াবে বলে— আমি জানি না। মানুষকে যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। উভয় ফেরেশতা বলে ঃ আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম তুমি একথা বলবে। এরপর মাটিকে আদেশ করা হয়, এর উপর মিলিত হয়ে যা। ফলে, মাটি তাকে এমনভাবে পিষ্ট করে দেয় যে, পাঁজরের হাড় এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। অতঃপর সর্বদা তাকে এমনিভাবে আযাব দেয়া হয়, যে পর্যন্ত পুনরুত্থান না হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন ঃ হে ওমর, তোমার কি দশা হবে যখন তুমি মরে যাবে! তোমার লোকজন তোমাকে নিয়ে যাবে এবং তোমার জন্যে দৈর্ঘে তিন হাত ও প্রস্থে দেড় হাত একটি গর্ত তৈরী করবে। তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে এবং সুগন্ধি লাগিয়ে কাঁধে তুলে নেবে। এরপর সেই গর্তে রেখে তোমার উপর মাটি ফেলে দেবে এবং দাফন করবে। তারা যখন তোমার কাছ থেকে ফিরে যাবে, তখন তোমার কাছে কবরে মুনকির, নকীর নামের দু'জন ফেরেশতা আসবে। তাদের আওয়াজ হবে বজ্রের মত কর্কশ, চক্ষু হবে বিদ্যুতের মত ঝলমলে, চুল হেঁচড়িয়ে যাবে এবং কবরকে দাঁত দিয়ে আঁচড়ে তারা তোমাকে নাড়া দেবে। তখন হে ওমর, তোমার কি অবস্থা হবে! হযরত ওমর আরয করলেন ঃ আমার জ্ঞান-বুদ্ধিও তখন বহাল থাকবে কি, যেমন এখন আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। হযরত ওমর বললেন ঃ তাহলে কোন চিন্তা করবেন না, তাদের জন্যে আমি যথেষ্ট হব।

এ হাদীসটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, মৃত্যুর পর জ্ঞান-বুদ্ধি বদলে

যায় না, কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলে যায়। মৃতব্যক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন ও সুখ-দুঃখ অনুভবকারী থেকে যায়; যেমন জীবদ্দশায় ছিল। মৃতের এই অংশে মৃত্যু ও অস্তিত্বহীনতা আসে না।

শিঙ্গার ফুঁক ঃ শিঙ্গার ফুঁক সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ -

অর্থাৎ— সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে, সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন, তারা নয়। অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ كَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى
الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ -

অর্থাৎ— যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন। কাফেরদের জন্যে এটা কঠিন।

يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا
صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ - فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِنَ
الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ
مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ -

অর্থাৎ, তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা

কখন পূর্ণ হবে? তারা তো অপেক্ষা করছে এক মহাচীৎকারের, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে যখন তারা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে। ফলে তারা ওসিয়ত করতে পারবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে মানুষ কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগাল? দয়াময় আল্লাহ তো এর ওয়াদাই দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

অতএব, যদি মৃতদের সামনে এই চীৎকারের আতংক ছাড়া অন্য কোন আতংক না থাকত, তবু একে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা, এটি এমন এক ভয়ংকর চীৎকার হবে, যাতে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবাই প্রাণত্যাগ করবে। কেবল আল্লাহ যাদেরকে বাঁচাতে চাইবেন, তারা বাঁচবে। বলা বাহুল্য, তারা হবে কয়েকজন ফেরেশতা। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

وكيف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة واصغى بالاذن ينتظر متى يومر بنفخ -

অর্থাৎ— আমি কিরূপে স্বস্তি পেতে পারি এমতাবস্থায় যে, শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মুখে রেখে দিয়েছে এবং মাথা নত করে কান পেতে রেখেছে, কখন ফুঁক দেয়ার আদেশ হয়ে যাবে।

হযরত মুকাতিল বলেন ঃ হযরত ইসরাফীল (আঃ) তূরীর আকৃতি বিশিষ্ট একটি শিঙ্গায় মুখ লাগিয়ে রেখেছেন। এই শিঙ্গার মুখের বৃত্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান। হযরত ইসরাফীল নিজের দৃষ্টি আরশের দিকে তুলে অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়ার আদেশ হবে? প্রথমবার যখন তিনি ফুঁক দেবেন, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ভয়ের আতিশয্যে প্রাণত্যাগ করবে। কেবল চারজন ফেরেশতা বেঁচে থাকবেন। তাঁরা হলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আঃ) এরপর আযরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হবে, প্রথমে জিবরাঈলের জান কবয করার জন্যে। এরপর মীকাঈলের, এরপর ইসরাফীলের জান কবয করা হবে। এরপর আযরাঈলকে নিজেই মরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি বরযখ জগতে থাকবে। অতঃপর

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীলকে জীবিত করে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

অর্থাৎ— অতঃপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া হবে। হঠাৎ তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

অর্থাৎ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে জীবিত হওয়াকে পর্যবেক্ষণ করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— আমাকে যখন আল্লাহ তা'আলা নবীরূপে পাঠান, তখন শিঙ্গাওয়ালা ইসরাফীলকে বলে পাঠান। তিনি শিঙ্গাকে মুখে লাগিয়ে নেন এবং এক পা পিছনে ও এক পা সামনে রেখে ফুঁক দেয়া নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। অতএব, তোমরা ফুঁককে ভয় কর।

সুতরাং সে অবস্থায় মানুষের দুর্গতি, লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের চিত্রটি মনে মনে কল্পনা কর এবং সৌভাগ্যসূচক নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করার কথা চিন্তা কর। এরপর নিজেকেও তাদের মধ্যে ধরে নাও। সবার যেমন দুরবস্থা হবে, তোমারও তেমনি হবে। তারা যেমন বিস্ময়াবিষ্ট থাকবে, তেমনি তুমিও থাকবে। বরং দুনিয়াতে যারা আমীর, বিত্তবান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ও রাজা-বাদশাহ ছিল, তারা সেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাতারে লাঞ্ছিত, নীচ, হেয় ও পদদলিত ধূলিকণার অনুরূপ হবে। সেদিন বন্য জন্তুরা বন ও পাহাড় থেকে এসে পলায়নের স্বভাব ভুলে গিয়ে মানুষের সাথে মিলেমিশে যাবে। তাদের কোন গোনাহ না থাকলেও সেদিনের উত্থান, ভীষণ নাদ ও শিঙ্গার ফুঁকের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা লম্ফ-ঝম্প বিস্মৃত হয়ে মানুষের সাথে মিলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

অর্থাৎ, যখন বন্য প্রাণীদের একত্র সমাবেশ হবে।

এরপর অবাধ্য শয়তানরা আসবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থাপিত হওয়ার ভয়ে মাথা নীচু করে থাকবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا -

অর্থাৎ— সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি তাদেরকে শয়তানদের সহ একত্রে সমবেত করবই। অতঃপর নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করবই।

অতএব, এখানে নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর, কি হবে!

হাশরের ময়দান ঃ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর মানুষকে নগ্নপদে নগ্নদেহে খতনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে হাঁকানো হবে। সেটি হবে এক নরম, সমতল ও সাদা রঙের ময়দান, যাতে আত্মগোপন করার মত কোন উঁচু টিলা ও নীচু গর্ত থাকবে না। সেদিকে মানুষকে দলে দলে পৌছানো হবে। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া সত্ত্বেও ভূ-পৃষ্ঠের চারদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে এক জায়গায় সমবেত করবেন। সে সময় অন্তরসমূহ ধড়ফড় করতে থাকবে এবং চোখসমূহ নত থাকবে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর একটি সাদামাঠা ময়দানে হবে। তাতে কোন প্রকার দালান-কোঠা থাকবে না— যাতে মানুষ আত্মগোপন করতে পারে।

হাশরের যমীন দুনিয়ার যমীনের মত হবে না। দুনিয়ার যমীনের সাথে এটা কেবল নামেই অভিন্ন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

অর্থাৎ— যেদিন এ যমীন অন্য যমীনে পরিবর্তিত হবে এবং আকাশও পরিবর্তিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যমীনে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে। এর বৃক্ষ,পর্বতমালা, বন-জঙ্গল ও অন্যান্য সবকিছু লোপ পাবে এবং ওকাযের চামড়ার মত ছড়ানো হবে। যমীন রৌপ্যের মত সাদা হবে, যার উপর কোন রক্তপাত ও গোনাহ হয়ে থাকবে না। নভোমণ্ডলের চাঁদ, সূর্য ও তারকা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যখন সে ময়দানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হয়ে যাবে, তখন উপর থেকে তারকারাজি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, সূর্য কিরণবিহীন এবং চন্দ্র আলোবিহীন হয়ে যাবে। ভূ-পৃষ্ঠ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। ঠিক এ অবস্থায় হঠাৎ মাথার উপর থেকে আকাশ ঘুরতে ঘুরতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফেরেশতারা এর চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। আকাশ হবে ধুনিত তুলার মত এবং মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ নগ্নপদে, নগ্নদেহে

খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা (রাঃ) — যিনি এই হাদীস রেওয়ায়েত করেন— বলেন ঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা একে অপরকে উলঙ্গ দেখব, এটা তো বড় সর্বনাশের কথা! তিনি বললেন ঃ সেদিন মানুষ অন্য চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। কারও দেখার ফুরসতই থাকবে না। এতেই অনুমান করা যায়, সেদিনটি কেমন ভয়ংকর হবে! কেন হবে না? কতক মানুষ তো পেটের উপর এবং কেউ মাথার উপর ভর দিয়ে চলবে। ফলে অপরের দিকে তাকানোর সাধ্য কোত্থেকে হবে?

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তিন ভাবে উঠানো হবে। এক, সওয়ার হয়ে। দুই, পায়ে হেঁটে এবং তিন মাথার উপর ভর দিয়ে। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, মাথার উপর ভর দিয়ে মানুষ কেমন করে চলবে? তিনি বললেন ঃ যিনি তাদেরকে পায়ের উপর ভর দিয়ে চালিয়েছেন, তিনি মাথার উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম।

মানুষ যে বিষয়ের সাথে পরিচিত নয়, তাকে অস্বীকার করা মানুষের স্বভাব। উদাহরণতঃ যদি মানুষ সাপকে পেটের উপর ভর দিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে না দেখে, তবে বলবে, পা ব্যতীত চলা সম্ভব নয়। আর যে কাউকে পায়ে চলতে না দেখে, সে পায়ে চলাকেও সুকঠিন মনে করবে। এই দৃষ্টিতে মানুষের উচিত, কিয়ামতের কোন আশ্চর্য বিষয় যদি তার নজরে না পড়ে, এরপর হঠাৎ দেখতে পায়, তবে সে তাকেও অস্বীকার করতে থাকে। অথচ সেটা একটা বাস্তব বিষয়।

এরপর হাশরের ময়দানে কি পরিমাণ ভিড় হবে, তাও লক্ষণীয়! সেখানে সুপ্ত আকাশ, সুপ্ত যমীনের বাশিন্দা অর্থাৎ, ফেরেশতা, জিন, মানব, শয়তান, বন্য জন্তু, হিংস্র প্রাণী ও পশুপক্ষী একত্র সমবেত হবে। অতঃপর তাদের মাথার উপর সূর্য অত্যন্ত তেজ সহকারে তাপ বিকিরণ করতে থাকবে। দুনিয়াতে সূর্যের যে প্রখরতা, তা বদলে যাবে এবং জনতার মাথা থেকে মাত্র দু'ধনুক দূরে অবস্থান করবে। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং নৈকট্যশীলগণ ছাড়া অন্য কেউ এই ছায়ায় স্থান পাবে না। তখন কিছু লোক আরশের ছায়াতলে থাকবে এবং কিছু লোক প্রখর রৌদ্রতাপে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকবে। ভিড়ের ধাক্কায় একজনের কাঁধ অন্যজনের কাঁধের সাথে মিলিত থাকবে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার সামনে যাওয়ার ভয় ও লজ্জা সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ফলে, তাদেরকে এক সাথে কয়েক প্রকারের উত্তাপ সইতে হবে। যেমন.

সূর্যের উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ, লজ্জা ও ভয় থেকে উদ্ভূত অন্তর্জ্বালা ইত্যাদি। এ সকল তাপ ও জ্বালার ফলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম বেরুতে থাকবে এবং ময়দানে প্রবাহিত হতে থাকবে। এরপর মানুষের শরীরের দিকে উত্থিত হতে শুরু করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে যার যতটুকু মর্তবা হবে, সে অনুপাতে তার ঘাম উপরে উঠবে। সেমতে কারও ঘাম উরু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কারও কান পর্যন্ত এবং কারও মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত হবে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে একথা পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। তীব্র ব্যাকুলতার কারণে ঘাম তাদের মুখের লাগাম হয়ে যাবে।

অতএব, হে মিসকীন, হাশরবাসীদের ঘাম এবং দুঃখ-দুর্দশা চিন্তা কর। এই কষ্টে পড়ে কেউ কেউ আরয করবে, এলাহী, আমাদেরকে এহেন বেদনা ও অপেক্ষার কষ্ট থেকে মুক্তি দাও যদিও আমরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হই। এই হবে হিসাব-নিকাশ ও আযাবের পূর্ববর্তী কষ্ট। তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে। জেনে রাখ, যদি দুনিয়াতে কারও ঘাম আল্লাহর পথে অর্থাৎ হজ্জ, জেহাদ, রোযা, নামায ও কোন মুসলমানের কল্যাণ সাধনে বের না হয়ে থাকে, তবে তার ঘাম সেদিন ভয় ও লজ্জার কারণে কিয়ামতের ময়দানে বের হবে এবং তার কষ্ট অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মূর্খতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হলে মানুষ নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে কষ্ট স্বীকার করা ও ঘাম বের হওয়া সহজ ও স্বল্পস্থায়ী বিষয়। পক্ষান্তরে হাশরের ময়দানে ঘাম বের হওয়া অত্যধিক কষ্টকর ও দীর্ঘস্থায়ী। কেননা, সে দিনটিই এমন যে, এতে মেয়াদ ও তীব্রতা উভয়টিই অধিক।

কিয়ামত দিবসের দীর্ঘতা ঃ কিয়ামত দিবসে মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের মন হবে ত্যক্ত-বিরক্ত। কেউ তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। তিনশ' বছর ধরে তারা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। না কোন লোকমা খাবে, না পানির কোন ঢোক গিলবে। বাতাসের কোন ঝাঁপটাও তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে না। হযরত কা'ব ও কাতাদাহ নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ— সেদিন মানুষ বিশ্ব-পালকের পথ পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

মানুষ তিনশ' বছর পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকবে। বরং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক জায়গায় এমনভাবে জমায়েত করবেন, যেমন তূণের মধ্যে তীরসমূহকে খচ্‌খচ্‌ করে ভরে দেয়া হয়। তিনি পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত তোমাদের প্রতি দৃকপাত করবেন না।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ তুমি সেদিনকে কি মনে কর, যেদিন মানুষ পায়ের উপর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মেয়াদ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। এ সময়ে তারা কোন লোকমা খাবে না এবং এক চুমুক পানিও পান করবে না। অবশেষে পিপাসার আতিশয্যে যখন তাদের ঘাড় আলাদা হয়ে যাবে, তখন দোযখে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে গরম পানির ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। অসহ্য কষ্টের সম্মুখীন হয়ে তারা একে অপরকে বলবে, চল, আল্লাহ তা'আলার কাছে যার ইযযত ও সম্মান রয়েছে, তাঁকে খুঁজে বের করি, যাতে সে আমাদের জন্যে শাফায়াত করে। অতঃপর তারা যে পয়গম্বরেরই দ্বারস্থ হবে, তিনিই তাদেরকে "নফসী, নফসী" বলে সরিয়ে দেবেন এবং বলবেন, আজ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এত বেশী, যা আর কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অবশেষে আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) যার জন্যে আদেশ পাবেন, তার জন্যে শাফায়াত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّامَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا

অর্থাৎ— যার জন্যে আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা পছন্দ করবেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও জন্যে শাফায়াত উপকারী হবে না।

এখন সে দিনের দৈর্ঘ চিন্তা কর। হাদীস শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, সেদিনটি মুমিনের জন্যে ততটুকু হালকা ও সামান্য হবে, যতটুকু সময়ের মধ্যে সে দুনিয়াতে একটি ফরয নামায আদায় করত; বরং এর চেয়েও সহজতর মনে হবে। অতএব তুমি চেষ্টা কর, যাতে এই ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কারণ, যে পর্যন্ত তোমার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অবশিষ্ট আছে, সে পর্যন্ত ব্যাপারটি তোমার এখতিয়ারাধীন।

সওয়াল প্রসঙ্গ ঃ হে মিসকীন, এসব অবস্থার পর তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে যে সওয়াল করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা কর। তুমি যখন কিয়ামতের সংকটময় অবস্থায় থাকবে, তখন হঠাৎ আকাশের প্রান্ত থেকে বিরাটকায়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা উত্থিত হবে। তাকে নির্দেশ দেয়া হবে— পাপীদের মাথার চুল ধরে সর্বশক্তিমানের সামনে পেশ হওয়ার স্থানে নিয়ে এস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে একজন ফেরেশতা রয়েছে। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী ব্যবধান মুসাফিরের এক বছর পর্যন্ত চলার পথের সমান। তখন কেউ কেউ ভয়ের আতিশয্যে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করে বসবে— পালনকর্তা তোমাদের ভেতরেই রয়েছেন কি? ফেরেশতারা সজোরে বলবে, আমাদের রব পবিত্র এবং তিনি আমাদের মধ্যে নন। তবে তিনি পরে আসবেন। এরপর ফেরেশতারা মানুষদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি বাস্তবরূপ লাভ করবে—

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ -

অর্থাৎ— আমি অবশ্যই তাদেরকে সওয়াল করব, যাদের প্রতি রসূল প্রেরিত হয়েছে এবং রসূলগণকেও অবশ্য সওয়াল করব, অতঃপর তাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

সওয়ালের শুরু হবে পয়গম্বরগণ থেকে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -

অর্থাৎ— যেদিন আল্লাহ পয়গম্বরগণকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি জওয়াব পেয়েছ? তাঁরা বলবে ঃ আমরা জানি না। তুমিই অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

অনুমান কর, সেদিনটি কেমন কঠিন হবে, যেদিন পয়গম্বরগণও হতভম্ব হয়ে যাবেন। এ প্রশ্নটির জওয়াব তাঁদের জানা ছিল, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কি বললেন, তা জানা থাকবে না।

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি রেসালত পৌঁছিয়েছ কি? তিনি আরয করবেন, হাঁ। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে কেউ পয়গাম পৌঁছিয়েছে কি? তারা আরয করবে— আমাদের কাছে তো কোন সতর্ককারী আসেনি!

হযরত ঈসা (আঃ)-কে ডেকে সওয়াল করা হবে, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, আমাকে ও আমার জননীকে দু'খোদা মেনে নাও? এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বছরের পর বছর পর্যন্ত অস্থির থাকবেন। অতঃপর ফেরেশতারা এসে এক এক ব্যক্তিকে ডেকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি, হে অমুক মহিলার পুত্র, পেশ হওয়ার জন্যে যথাস্থানে উপস্থিত হও। এই আওয়াজে মানুষ প্রকম্পিত হবে এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হবে। কেউ কেউ বাসনা প্রকাশ করবে, তাদের কুকর্ম হিসাবের জন্যে পেশ না করে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেই ভাল হত। সওয়ালের পূর্বে আরশের নূর প্রকাশিত হবে এবং হাশরের ময়দান উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেক মানুষ মনে করতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা বুঝি সওয়ালের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাকে ছাড়া কেউ আল্লাহকে দেখছে না এবং সওয়াল বুঝি কেবল তাকেই করা হবে— অন্য কাউকে নয়। এরপর জিবরাঈলকে বলা হবে— দোযখ আমার কাছে নিয়ে এস। জিবরাঈল দোযখের কাছে এসে বলবেন— মালিকের আদেশ পালন কর। দোযখ একথা শুনেই ক্রোধে জ্বলে উঠবে এবং উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে চীৎকার করবে। মানুষ তার তর্জন-গর্জন শুনে ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দোযখের রক্ষীরা নাফরমান বান্দাদের দিকে এগিয়ে আসবে। চিন্তা কর, তখন মানুষের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে! ভয়-ভীতিতে তাদের মন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। যালেম ও নাফরমানদের মধ্যে হায় হায় রব উঠবে এবং সিদ্দীকগণ "নফসী, নফসী" বলতে থাকবেন। ইত্যবসরে দোযখ দ্বিতীয় চীৎকার দিবে। তখন ভয় ও আতংক দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শক্তি শিথিল হয়ে যাবে। তারা জেনে নিবে তারা গ্রেফতার হবে। অতঃপর তৃতীয় চীৎকারের সাথে সাথে মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। দুঃখে যালেমদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে উদ্দেশ করে সওয়াল করবেন— তোমরা কি জওয়াব পেয়েছিলে? পয়গম্বরগণের এই শাসন দেখে গোনাহগারদের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং পিতা-পুত্রের কাছ থেকে, ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। অতঃপর প্রত্যেককে ধরে এনে আল্লাহ তা'আলার

সামনে পেশ করা হবে। তিনি কম-বেশী, প্রকাশ্য ও গোপন আমল সম্পর্কে সওয়াল করবেন এবং হাত-পা ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞেস করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন— কিয়ামতের দিন কি আমরা পরওয়ারদেগারকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ দুপুরের মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি মতবিরোধ কর? সবাই বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার চাঁদ মেঘমুক্ত আকাশে দেখার ব্যাপারে সন্দেহ কর কি? সবাই আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারেও তোমরা কোন সন্দেহ ও দ্বিধা করবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন ঃ আমি কি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি? তোমাকে সরদার করিনি? তোমাকে স্ত্রী দেইনি? ঘোড়া ও উটকে তোমার অনুগত করিনি? বান্দা বলবে ঃ জী হাঁ, এ সকল নেয়ামত তুমি দিয়েছিলে। আল্লাহ এবার বলবেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাত হবে এ ধারণা তোমার ছিল না? বান্দা বলবে— না। আল্লাহ বলবেন— আচ্ছা, তাহলে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি।

দাঁড়িপাল্লা ঃ এরপর দাঁড়িপাল্লার চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। সওয়ালের পর মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, যাদের কোন নেকী থাকবে না, তাদের জন্যে একটি কাল ঘাড় দোযখ থেকে বের হবে। পাখী যেমন মাটি থেকে দানা চয়ন করে, তেমনি সে ঘাড়টি তাদেরকে তুলে দোযখে ফেলে দেবে এবং দোযখ তাদেরকে গিলে ফেলবে। দুই, যাদের কাছে কোন বদী থাকবে না। তাদের জন্যে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করত, তারা দণ্ডায়মান হোক। এই ঘোষণা শুনে তারা দণ্ডায়মান হবে এবং জান্নাতে চলে যাবে। এরপর যারা তাহাজ্জুদ পড়ত, তাদের সাথেও এমনি আচরণ করা হবে। এরপর তাদের সাথেও করা হবে, যাদেরকে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর যিকর থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। তৃতীয় দল এমন লোকদের, যারা নেক আমলের সাথে বদ আমলও মিশ্রিত করেছে। বদ আমল তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকবে না। তাদের নেক আমল বেশী কি বদ আমল বেশী, তা আল্লাহ তা'আলার খুব ভালই জানা থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও পরিস্থিতি জানিয়ে দিতে চাইবেন, যাতে ক্ষমা করার সময় তাঁর অনুগ্রহ এবং শাস্তি দেওয়ার সময় তাঁর ন্যায়বিচার ফুটে উঠে। নেক আমল ও বদ

আমল সম্বলিত আমলনামাসমূহ উড়ানো হবে এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তখন মানুষের চোখগুলো আমলনামার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। নেকীর পাল্লা ঝুঁকে পড়ে কি বদীর পাল্লা। এটা হবে অত্যন্ত ভয় ও আশংকার মুহূর্ত। ফলে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি উড়ে যাবে।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে হযরত আয়েশা আখেরাত স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। ফলে, তাঁর গরম অশ্রু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গণ্ডদেশে পতিত হলে তিনি জেগে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আয়েশা, কাঁদছ কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আখেরাত স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাঁ। কিন্তু তিন জায়গায় মানুষ কেবল নিজেকেই স্মরণ করবে। প্রথম, যখন দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হবে এবং আমলসমূহ ওজন করা হবে। দাঁড়িপাল্লা হালকা হল কি ভারী হল— তা দেখে নেয়া পর্যন্ত এই আত্মমগ্নতা অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়, যখন আমলনামাসমূহ উড়িয়ে দেয়া হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে কি বাম হাতে আসে, সে অপেক্ষায় মানুষ নিজেকে ছাড়া সবকিছু ভুলে যাবে। তৃতীয়, পুলসিরাতে থাকাকালে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা মানুষকে মানদণ্ডের উভয় পাল্লার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা সজোরে ঘোষণা করবে, অমুক ভাগ্যবান হয়েছে। সে আর কখনও হতভাগ্য হবে না। এ ঘোষণার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টি শুনতে পাবে। আর যদি পাল্লা হালকা হয়, তবে ফেরেশতা সবাইকে শুনিয়ে ঘোষণা করবে। অমুক এমন হতভাগা হয়েছে যে, আর কোনদিন ভাগ্যবান হবে না। নেকীর পাল্লা হালকা হলে দোযখের ফেরেশতা লোহার গদা হাতে নিয়ে আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আসবে এবং যারা দোযখের ভাগে পড়বে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে ডেকে বলবেন ঃ হে আদম, দাঁড়াও এবং যারা দোযখে যাওয়ার, তাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দাও। তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ তাদের সংখ্যা কত হবে? আল্লাহ বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে খুবই চিন্তিত হলেন এবং কখনও মুখে হাসি ফুটালেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এই সদা বিমর্ষ অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা আমল কর এবং প্রফুল্ল থাক। কারণ, সেই

সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমাদের সাথে দু'টি সম্প্রদায় থাকবে, যাদেরকে মানুষের বিপরীতে দাঁড় করালে তাদের সংখ্যা বেশীই থাকে। এছাড়া আদমের যে সব সন্তান ও শয়তানের যত আওলাদ মারা গেছে, তারাও এই হাজারের মধ্যে রয়েছে। তাদের সংখ্যাও অনেক বেশী। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ সে দুটি সম্প্রদায় কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। রাবী বলেন ঃ একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আশান্বিত ও আনন্দিত হলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমল কর এবং প্রফুল্ল থাক। কসম সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমরা কিয়ামতে এমন হবে, যেমন উটের পাঁজরে কাল দাগ অথবা ঘোড়ার চোখে ঘর্ষণের দাগ।

পারস্পরিক হক দেয়ানোর কথা ঃ দাঁড়িপাল্লার আতংক জানার পর এখন উচিত যে, এই আতংক ও আশংকা থেকে সে ব্যক্তি মুক্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে এবং শরীয়তের দাঁড়িপাল্লায় নিজের আমল ও কথাবার্তা ওজন করবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমার হিসাব নেয়ার পূর্বে তুমি তোমার নিজের হিসাব নাও। নিজের হিসাব নেয়ার অর্থ মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক গোনাহ থেকে খাঁটি তওবা করা, অপরের হক কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেয়া এবং মুখে অথবা হাতে কারও মানহানি করে থাকলে অথবা অন্তর দ্বারা কারও প্রতি কুধারণা করে থাকলে তা মাফ করিয়ে নেয়া। মুমিনের এমনভাবে মৃত্যুবরণ করা উচিত যাতে কারও কোন হক অথবা কর্তব্য তার যিম্মায় অবশিষ্ট না থাকে। এরূপ মুমিন হিসাব ব্যতিরেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি কেউ হক আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামতের দিন হকদাররা এসে তাকে ঘিরে ফেলবে। কেউ হাত ধরবে, কেউ মাথার চুল এবং কেউ জামার কলার চেপে ধরে বলবে— তুমি আমার উপর যুলুম করেছ, তুমি আমাকে গালি দিয়েছ, তুমি আমার সাথে উপহাস করেছ, তুমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমাকে ঠকিয়েছ, তুমি প্রতিবেশী হয়েও আমাকে কষ্ট দিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি। হকদারদের প্রচুর ভিড় দেখে সে হয়রান-পেরেশান হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে এই আশায় মাথা তুলে তাকিয়ে থাকবে যে, তিনিই তাদের কবল থেকে তাকে মুক্তি দেবেন। এমনি অবস্থায় তার কানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে—

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ -

অর্থাৎ— আজকের দিনে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ কোন যুলুম হবে না।

এরপর তার সারা জীবনের পরিশ্রম-লব্ধ নেক আমলসমূহ কেড়ে নিয়ে হকদারদের হকের বিনিময়ে প্রদান করা হবে। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমাদের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতে অনেক নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কারও প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে থাকবে, কারও ধন-সম্পদ আত্মসাত করে থাকবে, কাউকে খুন করে থাকবে এবং কাউকে প্রহার করে থাকবে। ফলে, তার নেকীসমূহ এসব হকদারকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার সমস্ত নেকী দেয়ার পরও হক অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে হকদারদের পাপসমূহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

অর্থাৎ— পৃথিবীতে সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী তোমাদের মতই উম্মত।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল সৃষ্টিই পুনরুত্থিত হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার এমন হবে যে, তিনি শিংবিহীন জন্তুর হক শিংবিশিষ্ট জন্তুর কাছ থেকে নেবেন। অতঃপর বলবেন— মাটি হয়ে যাও। তখন কাফের আশংকা করবে, হায়, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম!

অতএব , হে মিসকীন, তোমার কি দশা হবে, যেদিন তুমি তোমার আমলনামা নেকীশূন্য পাবে, অথচ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে নেকী উপার্জন করেছিলে? তুমি বলবে, আমার নেকী কোথায় গেল? উত্তরে তোমাকে বলা হবে, তোমার নেকীসমূহ তোমার হকদারদের আমলনামায় চলে গেছে। শুধু তাই নয়, তুমি তোমার আমলনামাকে গোনাহে পরিপূর্ণ দেখতে পাবে; অথচ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তুমি এসব গোনাহ

থেকে আত্মরক্ষা করেছিলে। তুমি জিজ্ঞেস করবে— ইলাহী, এসব গোনাহ তো আমি কখনও করিনি। এগুলো আমার আমলনামায় কেন? উত্তর হবে— এগুলো সে সব লোকের গোনাহ, যাদেরকে তুমি গালি দিয়েছিলে, যাদের গীবত করেছিলে, ক্ষতি করেছিলে এবং ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকিয়েছিলে।

পুলসিরাত ঃ অতঃপর হে মিসকীন, নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ـ

অর্থাৎ, যেদিন আমি পরহেযগারদেরকে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে রহমান আল্লাহর কাছে একত্রিত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

অতঃপর এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তাদেরকে চালনা কর জাহান্নামের পথে এবং তাদেরকে থামিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ভয়াবহ অবস্থাসমূহের পর মানুষকে সিরাতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এটি দোযখের উপর নির্মিত। তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো ও চুলের চেয়ে অধিক সরু একটি পুল। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে জীবন যাপন করবে, সে আখেরাতের পুলসিরাতে হালকা হবে এবং নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে অধিক পাপের কারণে যার পৃষ্ঠদেশ ভারী হবে, পুলসিরাতের প্রথম ধাপেই তার পদস্খলন ঘটবে এবং সে দোযখে পতিত হবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— পুলসিরাত দোযখের মাঝখানে স্থাপিত হবে। পয়গম্বরগণের মধ্যে আমি উম্মতকে নিয়ে তাতে অবতরণ করব। সেদিন পয়গম্বরগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না। সকল পয়গম্বর এ কথাই বলবেন— "আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ বাঁচাও।" দোযখে সা'দানের কাঁটার মত কাঁটা থাকবে। (সা'দান এক প্রকার ঘাস, যাকে উট খুব চিচিয়ে খায়। এর কাঁটার আকৃতি স্তনের অগ্রভাগের মত।) তোমরা

সা'দানের কাঁটা দেখেছ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আকৃতি সে রকমই হবে; কিন্তু বড় কতটুকু হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের আমল অনুসারে সে কাঁটা তাদের গায়ে বিদ্ধ হবে। কেউ কেউ তো তার বদ আমলের কারণে ধ্বংসই হয়ে যাবে। কেউ নিষ্পেষিত হয়ে সরিষার মত হয়ে যাবে এবং পুনরায় নিষ্পেষিত হবে।

আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, মানুষ দোযখের পুলের উপর দিয়ে গমন করবে। তার উপর থাকবে কাঁটা এবং অগ্রভাগ বাঁকানো লোহার শলাকা, যা ডান ও বাম দিক থেকে এসে মানুষকে জড়িয়ে ধরবে। পুলের উভয় পার্শ্বের ফেরেশতারা বলবে— ইলাহী, বাঁচাও, ইলাহী, বাঁচাও। কোন কোন লোক বিদ্যুতগতিতে পুল পার হয়ে যাবে— কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, কেউ হাঁটার মত এবং কেউ দৌড়ের বেগে অতিক্রম করবে। যারা দোযখের স্থায়ী অধিবাসী, তারা মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। কিন্তু যারা গোনাহের কারণে যোযখে যাবে এবং জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে, তাদের জন্যে শাফায়াতের অনুমতি হবে এবং তারা একদিন না একদিন মুক্তি পাবে।

শাফায়াত ঃ আযাবের যোগ্য বলে প্রমাণিত কোন কোন ঈমানদারের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কৃপা করতে চাইবেন। সেমতে তাদের সম্পর্কে শাফায়াত করার জন্যে তিনি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি দেবেন। এ কাজের জন্য যাঁরা অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন, তারা হলেন পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্তবা ও সদাচরণের অধিকারী ব্যক্তি। তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের শাফায়াত কবুল করবেন। অতএব, তাঁদের কাছে শাফায়াতের মর্তবা হাসিল করার জন্য মানুষের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর কয়েকটি উপায় রয়েছে—

(১) কোন মানুষকে কখনও হেয় মনে করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর "বেলায়েত" (বন্ধুত্ব) বান্দাদের মধ্যে গোপন রেখেছেন। অতএব, তোমার দৃষ্টিতে যে হেয় হতে পারে, সে আল্লাহর ওলী হতে পারে।

(২) কোন গোনাহকে কখনও ছোট মনে করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর গযব তাঁর অবাধ্যতাসমূহের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন। অতএব, যে গোনাহকে তুমি সামান্য মনে করবে, তার মধ্যে আল্লাহর গযব নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

(৩) কোন আনুগত্য ও এবাদতকে ক্ষুদ্র মনে করবে না। কারণ, আল্লাহ

তা'আলা নিজ সন্তুষ্টি তাঁর এবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে গোপন রাখতে পারেন। অতএব, যে এবাদতকে তুমি ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে, তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিও থাকতে পারে।

শাফায়াতের প্রমাণ কোরআন শরীফ ও হাদীসে অনেক বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى -

অর্থাৎ— অচিরেই আপনার পালনকর্তা আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি পাঠ করলেন ঃ

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত এবং যে অবাধ্যতা করে, তার জন্য তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

এরপর তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই উক্তি তেলাওয়াত করলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ -

অর্থাৎ— তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত তুলে বললেন ঃ ইলাহী, আমার উম্মতের কি হবে? একথা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমার হাবীবের কাছে যাও এবং কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস কর। সেমতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি উম্মতের কারণে কাঁদছি। অথচ এসবই আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে একথা আরয

করলে নির্দেশ হল ঃ যাও, আমার হাবীবকে বলে দাও, আমি তার উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন— আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে। এক, এক মাসের ব্যবধান থেকে আমার ভীতি। দুই, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারও জন্য তা হালাল ছিল না। তিন, আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। এর মাটিকেও পবিত্র করার উপাদান করা হয়েছে। অতএব, নামাযের সময় হয়ে গেলে আমার উম্মত পানি না পেলেও নামায পড়তে পারে। কেননা, তায়াম্মুমের মাটি সর্বত্রই মওজুদ রয়েছে। নামায পড়ার জন্য বিশেষ জায়গারও শর্ত নেই। কারণ, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠই সেজদার স্থান। চার, আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পাঁচ, প্রত্যেক নবী বিশেষ ভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আমি বিশ্বমানবের জন্যে প্রেরিত হয়েছি। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন আমি নবীগণের ইমাম হব। কিন্তু তাই বলে গর্ব করি না। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার। এজন্য গর্ব করি না। ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে যারা উত্থিত হবে, আমি হব তাদের প্রথম ব্যক্তি। আমি প্রথম সুপারিশকারী হব এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমার হাতে থাকবে হামদের পতাকা। আদম (আঃ) ও অন্য সবাই এর তলে থাকবে। আরও এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয়। আমি চাই , আমার দোয়াটি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য কিয়ামতের দিন ব্যবহার করব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের জন্য স্বর্ণের মিম্বর বিছানো হবে। তাঁরা তার উপর বসবেন। কিন্তু আমার মিম্বর খালি থাকব। আমি তাতে বসব না এবং পরওয়ারদেগারের সামনে এই আশংকায় দাঁড়িয়ে থাকবে যে, আমাকে না আবার জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয় অথচ আমার উম্মত পেছনে থেকে যায়। আমি আরয করব ঃ পরওয়ারদেগার, আমার উম্মত! আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করবেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার উম্মতের সাথে আমার কি আচরণ প্রত্যাশা কর? আমি আরয করব ঃ ইলাহী! তাদের হিসাব দ্রুত সম্পন্ন হোক। এভাবে আমি সুপারিশ করতে থাকব। অবশেষে যারা দোযখে প্রেরিত হয়ে গেছে, তাদেরও মুক্তির আদেশনামা আমি পেয়ে যাব। দোযখের দারোগা মালেক বলবে ঃ হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে গযবের আগুনের কোন প্রাপ্য রাখেননি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে গোশত আনা হল এবং তা থেকে একটি বাহু তাঁকে দেয়া হল। কারণ, এটা তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি বাহুর মাংস দাঁত দিয়ে কাটলেন, অতঃপর বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি মানুষের সরদার হব। এর কারণ কি তোমরা জান? আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এক ময়দানে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে চোখের সামনে রাখবেন। সূর্য মাথার উপরে নিকটেই থাকবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত থাকবে। তারা একে অপরকে বলবে ঃ দেখ না, আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে? এমন কোন লোক তালাশ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করবেন। সেমতে তারা বলবে, চল হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে যাই। তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি মানব-পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সেজদা করিয়েছেন। আজ আপনার পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় আছি। আদম (আঃ) জওয়াবে বলবেন, আজ আমার পরওয়ারদেগার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। এরূপ ক্রুদ্ধ পূর্বেও হননি এবং পরেও হবেন না। এছাড়া তিনি আমাকে জান্নাতের একটি ফল খেতে বারণ করেছিলেন। আমি তাঁর আদেশ মান্য করিনি। তাই আমার নিজের প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে পড়েছে। তোমরা হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করবে, আপনি পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে প্রথম রসূল হয়ে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা আখ্যা দিয়েছেন। আজ আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখুন, আমাদের কী দুরবস্থা! তিনি জওয়াব দেবেন, আজ আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক রাগান্বিত। এরূপ রাগ এর পূর্বেও হননি এবং পরেও হবে না। এছাড়া আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি বদ দোয়া করেছিলাম। তাই আমি নিজের চিন্তায়ই বাঁচি না। তোমরা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও। সেমতে তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করবে, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর এবং সকল মানুষের মধ্যে আপনিই তাঁর খলীল। দয়া করে পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দেবেন, আমার পরওয়ারদেগার আজ এমন ক্রুদ্ধ যে, এর আগে তিনি কখনও এরূপ হননি এবং পরেও হবেন না। তাছাড়া, আমি তিনবার অসত্য বলেছিলাম। তাই আমি এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে একাধারে রেসালত ও কালাম উভয়টি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখন পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমাদের দুরবস্থা তো আপনার অজানা নেই। হযরত মূসা (আঃ) জওয়াব দেবেন, আমার পরওয়ারদেগার এত রাগান্বিত যে, এর আগে কখনও এরূপ হননি এবং পরেও হবেন না। আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর আদেশ ছাড়াই খুন করেছিলাম। তাই আমি নিজেকে নিয়েই উৎকণ্ঠিত। তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহর রসূল, মরিয়ম (আঃ)-কে প্রদত্ত তাঁর কলেমা এবং তাঁর রূহ। আপনি মাতৃক্রোড়ে থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত ঈসা (আঃ) জওয়াবে আল্লাহ তা'আলার অভূতপূর্ব ক্রোধের উল্লেখ করে বলবেন, আমি আজ নিজের চিন্তায়ই মগ্ন। তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যাও।

অতঃপর মানুষ আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগের ও পেছনের সকল গোনাহ মার্জনা করেছেন। পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমি আরশের নীচে উপস্থিত হয়ে পরওয়ারদেগারের উদ্দেশে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে এমন বিষয় খুলে দেবেন, যা পূর্বে কারও কাছে খোলেননি। এরপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা তোল। চাও, যা চাইবে, পাবে। শাফায়াত কর। তোমার শাফায়াত কবুল হবে। সেমতে আমি মাথা তুলে বলব, উম্মতী, উম্মতী, ইয়া রব অর্থাৎ, আমার উম্মতকে মাফ করে দাও। এরশাদ হবে, হে মুহাম্মদ, তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে ভেতরে পৌঁছে দাও। বাকী দরজাগুলোতে তোমার উম্মত অন্যদের সাথে শরীক। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতের দু'কপাটের মধ্যে দূরত্ব এতটুকু, যতটুকু মক্কা ও হেমইয়ারের মধ্যে অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যে রয়েছে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তিনটি অসত্য ভাষণও উল্লিখিত আছে। এক— তারকারাজি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ঃ هٰذَا رَبِّىْ এ আমার পরওয়ারদেগার! দুই— কাফেরদের উপাস্য মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে চুরমার করার পর বলেছিলেন—

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا

অর্থাৎ, বরং এটা তাদের এই বড় মূর্তির কাজ। তিন—কাফেররা তাঁকে মেলায় নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেছিলেন— إِنِّي سَقِيمٌ —আমি অসুস্থ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতের আলেম ও সৎ ব্যক্তিরাও সুপারিশ করবে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, এক ব্যক্তিকে আদেশ করা হবে— ওঠ এবং সুপারিশ কর। সে উঠে আপন বংশধর ও পরিবার-পরিজনের জন্য এবং আমল অনুযায়ী দু'এক ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করবে।

হাউযে কাওছার ঃ হাউয একটি অনন্যসাধারণ দান, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এর গুণাগুণসম্বলিত অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, তিনি দুনিয়াতে এর জ্ঞান এবং আখেরাতে এর স্বাদ নসীব করবেন। এই হাউযের প্রভাব এই যে, কেউ এর পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হয় না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হালকা নিদ্রার পর যখন গাত্রোত্থান করলেন,তখন তাঁর চোখে-মুখে হাসির রেখা সুস্পষ্ট ছিল। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন ঃ একটি আয়াত আমার প্রতি এই মুহূর্তে অবতীর্ণ হয়েছে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ — অর্থাৎ, আমি আপনাকে কাওছার দান করলাম।

তিনি আরও বললেন ঃ তোমরা জান কাওছার কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি একটি নির্ঝরিণী, যা আমার পরওয়ারদেগার আমাকে জান্নাতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে একটি বরকতময় হাউয আছে। আমার উম্মত কিয়ামতের দিন এই হাউযে যাবে। এর পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ (মেরাজের সফরে) আমি জান্নাত পরিভ্রমণ করেছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল একটি নহরের উপর, যার দু'সারি মোতি নির্মিত খিলানসমূহ শূন্যগর্ভ ছিল।

আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা কাওছার, যা আপনাকে আপনার রব দান করেছেন। এরপর ফেরেশতা তাতে হাত লাগালে দেখা গেল এর মাটি ইযফির জাতীয় মেশ্‌ক।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, ইন্না আ'তাইনা সূরা অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ কাওছার জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর। এর কিনারা স্বর্ণের এবং এর পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং মেশ্‌কের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এই পানি মুক্তা ও প্রবালের কংকরের উপর প্রবাহিত।

দোযখ ও তার ভয়ানক অবস্থা ঃ লোক সকল, তোমরা ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল দুনিয়ার ধান্দায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের সম্পর্কে গাফেল হয়ে আছ। অথচ এখান থেকে তোমাদের একদিন না দিন চলে যেতে হবে। অতএব, এখানকার চিন্তা বাদ দিয়ে তোমরা সে জায়গার কথা চিন্তা কর, যেখানে তোমরা অবতরণ করবে। অর্থাৎ এটা জানা হয়ে গেছে যে, জাহান্নামের আগুন সকলেরই অবতরণস্থল। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থাৎ,— তোমাদের প্রত্যেকেই সেখানে (জাহান্নামে) অবতরণ করবে। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।

এ আয়াত দৃষ্টে অবতরণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত এবং মুক্তি পাওয়া সন্দিগ্ধ। সুতরাং এখন মনে মনে এই অবতরণস্থলের ভয়াবহতা চিন্তা কর। এতে আশা করা যায়,আত্মরক্ষার প্রেরণা জাগ্রত হবে।

হাশরের ময়দানে মানুষ যখন সুপারিশকারীর সুপারিশের ফলাফল জানার অপেক্ষা করবে, তখন অপরাধীদেরকে গভীর অন্ধকার এসে ঘিরে ফেলবে এবং তাদেরকে স্ফুলিঙ্গ বিস্তারকারী আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তাদের কানে আসবে, যা ক্রোধের পরিচায়ক। তখন অপরাধীরা নিজেদের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং সবাই নতজানু হয়ে বসে পড়বে। দোযখের এক ফেরেশতা একথা বলতে বলতে বের হবে ঃ কোথায় অমুকের পুত্র অমুক, যে দুনিয়াতে দীর্ঘ আশা পোষণ করে সৎ কাজে বিলম্ব করত এবং মন্দ কাজে জীবন বরবাদ করত। ফেরেশতা লোহার গদা নিয়ে তার প্রতি ধাবিত হবে এবং আযাবের দিকে টেনে নিয়ে উপুড় করে দোযখের গভীরে নিক্ষেপ করবে। এরপর বলবে, স্বাদ আস্বাদন কর এবং এই অগ্নিশালাতেই বন্দী থাক। এখানে খেতে হবে

আগুন, পান করতে হবে আগুন, বস্ত্র হবে আগুনের এবং শয্যা হবে আগুনের।

দোযখের সাতটি স্তর একটি অপরটির উপরে রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জাহান্নাম, এরপর সাকার, এরপর লাযা, এরপর হুতামা, এরপর সাঈর, এরপর জাহীম এবং সর্বনিম্ন স্তরকে বলা হয় হাবিয়া। হাবিয়ার গভীরতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই; যেমন দুনিয়ার কামনা-বাসনারও কোন সীমা নেই। দোযখের স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্য তেমন, যেমন মানুষের দুনিয়া নিয়ে মত্ত হওয়ার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। কেউ কেউ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকে, আবার কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে আগুনের শাস্তিও তাদের বিভিন্নরূপ হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কণা পরিমাণও যুলুম করবেন না। এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি দোযখে যাবে, তার উপর উপর্যুপরি সব রকম আযাব হওয়া অপরিহার্য নয়, বরং প্রত্যেকের আযাব একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত হবে, যা তার নাফরমানীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এরপরও যে ব্যক্তি ন্যূনতম আযাব ভোগ করবে, তার অবস্থা এমন হবে যে, সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়, সে কষ্টের তীব্রতার বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখে ন্যূনতম আযাব হবে ঃ দু'টি আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। যার ফলে তার মগজ উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করতে থাকবে। দেখ, যার হালকা আযাব হবে, তারই যখন এই অবস্থা হবে, তখন যে ব্যক্তি কঠোর আযাব ভোগ করবে, তার কি অবস্থা হবে? আগুনের আযাবের ব্যাপারে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তবে আঙ্গুল আগুনের কাছে নিয়ে যাও এবং এ থেকে দোযখের আগুন কেমন হবে,তা অনুমান করে নাও। কিন্তু তোমার এই অনুমানও সঠিক হবে না। কেননা, দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুল্য নয়। তবে দুনিয়াতে কোন শাস্তি আগুনের শাস্তির তুলনায় কঠোরতম নয় বিধায় দোযখের শাস্তি বুঝবার জন্যে দুনিয়ার আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নতুবা দোযখীদেরকে দোযখের আগুনের পরিবর্তে দুনিয়ার আগুন দেয়া হলে তারা খুশীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ, দোযখের আগুনের কষ্ট অনেক বেশী। এর তুলনায় দুনিয়ার আগুন যেন সুখের বস্তু। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ার আগুনকে রহমতের পানি দ্বারা ধৌত করার পর এটা দুনিয়ার মানুষের ব্যবহারোপযোগী

হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশে জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে। ফলে, এখন সেটা কাল অন্ধকারে পরিণত হয়ে আছে। অন্য এক হাদীসে আছে, দোযখ তার পরওয়ারদেগারের কাছে অভিযোগ করে বলল ঃ ইলাহী, আমার কতক অংশ কতক অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'টি শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন— একটি শীতকালে ও একটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে তুমি যে অসহ্য গরম অনুভব কর, সেটা দোযখের শ্বাসেরই উত্তাপ। আর শীতকালে যে কনকনে শীত পড়ে, সেটা তারই শ্বাসের প্রভাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক ঐশ্বর্যে লালিত অপরাধীকে উপস্থিত করে আদেশ করা হবে একে আগুনে ডুবিয়ে আন। ডুবানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুনিয়াতে কখনও সুখ পেয়েছিলে কি? সে বলবে, না। পক্ষান্তরে যে মুমিন দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্ট ভোগ করবে, তাকে এনে আদেশ করা হবে, একে জান্নাতে ডুবিয়ে আন। ডুবানোর পর তাকে প্রশ্ন করা হবে, দুনিয়াতে তুমি কখনও কষ্ট ভোগ করেছ কি? সে বলবে, না।

দোযখীদের দেহ থেকে এত বেশী দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ প্রবাহিত হবে যাতে দোযখীরা ডুবে যাবে। কোরআনের ভাষায় এই পুঁজের নাম "গাস্‌সাক"। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি জাহান্নামের এক বালতি গাসসাক দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তবে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। দোযখীরা পিপাসায় কাতরোক্তি করলে এই পুঁজ তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। সেমতে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَاهُوَ بِمَيِّتٍ -

অর্থাৎ— তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং সেটা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হবে। চারদিক থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু; কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا -

অর্থাৎ— তারা পানির জন্যে কাতরোক্তি করলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটা কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!

এরপর তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেয়া হবে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ -

অর্থাৎ— অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীরা, তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে। অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি— পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মত।

আরও বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ— এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে। এর মোচা সাপের ফণার মত। জাহান্নামীরা এটা ভক্ষণ করবে, অতঃপর এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি এর সঙ্গে তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। পরে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে জাহান্নাম।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ -

অর্থাৎ— তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদেরকে পান করানো হবে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا -

অর্থাৎ— আমার কাছে আছে শৃঙ্খল, জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি যাক্কুমের একটি ফোঁটা দুনিয়ার স্থলভাগে পড়ে যায়, তবে পরিবেশ দূষণের কারণে দুনিয়ার সকল মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। অতএব, এটা যাদের খাদ্য হবে, তাদের কি দশা হবে!

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ের উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে আগ্রহী হও এবং যে বিষয়ে সতর্ক করেছেন, তাকে ভয় কর ও সতর্ক হও। অর্থাৎ তাঁর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং জাহান্নামকে ভয় কর।

জান্নাত ও তার অপার সুখ ঃ দোযখের বিপরীতে জান্নাত ও তার অশেষ আনন্দের কথাও স্মরণ করা দরকার। কেননা, যে ব্যক্তি এতদুভয়ের যে কোন একটি থেকে দূরে থাকবে, সে অবশ্যই অপরটিতে অবস্থান করবে। অতএব, দোযখের ভয়াবহতা চিন্তা করে অন্তরে ভয় সৃষ্টি করার সাথে সাথে জান্নাতের অনন্ত সুখ ও আনন্দের কথা ভেবে অন্তরে আশার সঞ্চার করা জরুরী।

জান্নাতের অবস্থা জানতে চাইলে তোমার উচিত কোরআন মজীদ পাঠ করা। এ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনার চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং সূরা আর-রহমানের وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সূরা ওয়াকেয়া ও অন্যান্য সূরা পাঠ কর। আর যদি হাদীসের দৃষ্টিতে জান্নাতের বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাও, তবে এক্ষেত্রে জান্নাতের কয়েকটি বিষয়ই বর্ণনা সাপেক্ষ।

(১) জান্নাতের সংখ্যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা আর-রহমানের

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্য নির্মিত। এর যাবতীয় আসবাবপত্র এবং অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই রৌপ্য নির্মিত হবে। এছাড়া আরও দু'টি জান্নাত থাকবে, যাতে আসবাবপত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছু হবে স্বর্ণ নির্মিত।

(২) জান্নাতের দরজাসমূহ মৌলিক এবাদতের সংখ্যানুসারে বিভিন্ন রূপ হবে। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দু'টি জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে। জান্নাতের দরজা আটটি। যে ব্যক্তি নামাযী হবে, তাকে নামাযের দরজা দিয়ে, যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, তাকে রাইয়্যান দরজা দিয়ে, যে ব্যক্তি দাতা হবে, তাকে দানের দরজা দিয়ে এবং যে ব্যক্তি মুজাহিদ হবে, তাকে জেহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। তবে কেউ এমনও হবে, যাকে সকল দরজা দিয়েই ডাকা হবে।

(৩) জান্নাতের কক্ষ ও সুউচ্চ স্তরও বিভিন্নরূপ হবে। মানুষের বাহ্যিক এবাদত ও আন্তরিক এবাদতের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে, তেমনি এগুলোর ছওয়াবেও পার্থক্য থাকবে। সুতরাং কেউ যদি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর পেতে চায়, তবে এবাদতের প্রতিযোগিতায় তার সকলের অগ্রে থাকার চেষ্টা করা উচিত। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীরা উচ্চস্তর বিশিষ্টদেরকে নিজেদের উপরে এমনভাবে দেখবে, যেমন তোমরা তারকাসমূহকে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে যেতে দেখ। কারণ, জান্নাতীদের মধ্যেও মর্তবার অনেক তফাৎ হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এই স্তরসমূহ কি কেবল পয়গম্বরগণই পাবেন? তাদের ছাড়া অন্যরা কি পাবে না? তিনি বললেন ঃ কেন পাবে না! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এই স্তরসমূহের অধিকারী তারা হবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

হযরত জাবের বর্ণনা করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন আমাদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে জান্নাতের জানালাসমূহের বর্ণনা দেব। আমি বললাম ঃ খুব ভাল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ জান্নাতের জানালা হবে মণিমুক্তা নির্মিত। এগুলো দিয়ে ভেতরের বস্তু বাইরে এবং বাইরের বস্তু ভিতরে মনে হবে। এগুলোর সুখ ও আনন্দ কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কেউ মনে মনেও কল্পনা করেনি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এসব জানালা কারা পাবে? তিনি বললেন ঃ যারা সালামের প্রসার ঘটায়, আহার করায়, সর্বদা

রোযা রাখে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমায়, তখন নামায পড়ে। আমরা বললাম ঃ এসব কাজের শক্তি কার আছে? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের এই শক্তি রয়েছে। আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার পর সালাম করে অথবা সালামের জওয়াব দেয়, সে সালামের প্রসার ঘটায়। যে নিজের পরিবার-পরিজনকে পেট ভরে আহার করায়, সে খাদ্য খাওয়ায়। আর যে রমযানের রোযা রাখে এবং প্রতিমাসে তিনটি করে রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখে। যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, সে রাতে নামায পড়ে, যখন অন্যরা অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারীরা ঘুমায়।

(৪) জান্নাতের প্রাচীর, যমীন, বৃক্ষ ও নহর সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, যারা এগুলোতে থাকবে, তারা এসবের আকৃতি দেখে কতই না আনন্দিত হবে! পক্ষান্তরে যারা এ থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কতই না পরিতাপ করবে!

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাত প্রাচীরের এক ইট হবে রৌপ্যের এবং এক ইট স্বর্ণের। এর মাটি হবে জাফরান এবং কাদা মেশক। এক হাদীসে আছে— জান্নাতের নহরসমূহ মেশকের টিলা অথবা মেশকের পাহাড় থেকে নির্গত। অন্য এক রেওয়ায়েতে রসূল করীম (সাঃ) বলেন— জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী একশ' বছর চললেও তা শেষ হবে না।

কোরআন মজীদে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (সুদীর্ঘ ছায়ায়) বলা হয়েছে।

হযরত আবু উমামা বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম বলাবলি করতেন, আল্লাহ তা'আলা বেদুঈন ও তাদের সমস্যাদির দ্বারা আমাদেরকে উপকার পৌছান। একবার জনৈক বেদুঈন এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে কষ্টদায়াক বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন। জান্নাতে কোন কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকবে, এটা আমার জানা ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কোন্ বৃক্ষের কথা বলছ? সে আরয করল ঃ আমি বদরী বৃক্ষের কথা বলছি, যাতে কাঁটা থাকে। তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে

আল্লাহ বলেন ঃ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ অর্থাৎ, কন্টকহীন বদরী বৃক্ষের তলে।

আল্লাহ তা'আলা এই বৃক্ষের কাঁটা কেটে দেবেন এবং প্রত্যেক কাঁটার জায়গায় একটি ফল লাগাবেন। প্রত্যেক ফলের উৎকৃষ্ট স্বাদ হবে এবং একটি অপরটির সাথে মিলবে না।

(৫) জান্নাতীতের পোশাক, শয্যা, আসন, তাঁবু ইত্যাদিও উৎকৃষ্টতর হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ-

অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীদেরকে স্বর্ণের কংকণ ও মোতি পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী। কোরআনের আয়াতসমূহে এর আরও অনেক বিবরণ রয়েছে। হাদীসেও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে— যে জান্নাতে দাখিল হবে, সে নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে। সে অভাবগ্রস্ত হবে না। তার বস্ত্র পুরাতন হবে না। যৌবন অক্ষুণ্ন থাকবে। জান্নাতের নেয়ামত এমন, যা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং মনও কল্পনা করেনি।

(৬) জান্নাতীদের আহার্য বস্তু সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের খাদ্য, ফলমূল, মোটা তাজা পাখি, মান্না ও সালওয়া, মধু, দুধ, আরও অসংখ্য প্রকারের বস্তু হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে—

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا -

অর্থাৎ— যখনই তারা সেখানকার কোন ফল খাওয়ার জন্যে পাবে, তখনই বলবে— এটা তো আমরা পেয়েছিলাম ইতিপূর্বে। বস্তুত তাদেরকে এক রকম খাদ্যই দেয়া হবে। জান্নাতীদের পানীয় দ্রব্যের অবস্থাও অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ছওবান (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। এক পর্যায়ে সে বলল ঃ পুলসিরাতে সর্বপ্রথম কারা অবতরণ করবে? তিনি বললেন ঃ ফকীর-মুহাজিরগণ। ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জান্নাতে যাওয়ার পর তারা কি উপঢৌকন পাবে? তিনি বললেন ঃ মাছের কলিজার কাবাব। সে বলল ঃ এরপর তাদের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের বলদ, যেগুলো জান্নাতের কিনারায় খায়-দায়। এগুলো তাদের জন্যে যবাই করা হবে। সে প্রশ্ন করল ঃ তারা পানি কী পান করবে?

তিনি বললেন ঃ তারা "সালসাবিল" নামক ঝরনা থেকে পানি পান করবে। ইহুদী বলল ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের জওয়াবে বললেন ঃ জান্নাতীদের এক একজনকে একশ' পুরুষের পানাহার ও সহবাসের শক্তি দান করা হবে। ইহুদী বলল ঃ যে পানাহার করে, তার পায়খানা করার প্রয়োজন হয়। তিনি বললেন ঃ পায়খানার পরিবর্তে তাদের ত্বক থেকে মেশকের মত প্রবাহিত হবে। এতেই পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের পাখী দেখে তুমি তা খাওয়ার ইচ্ছা করলে তোমার সামনেই পাখীটি যবাই হয়ে ভাজা হয়ে যাবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ — এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন— জান্নাতীদের মধ্যে সত্তরটি স্বর্ণের পিয়ালা পেশ করা হবে। প্রত্যেকটিতে নতুন ধরনের খাদ্য থাকবে, যা অন্যটিতে থাকবে না।

(৭) হূর ও গেলমানের গুণাবলী কোরআন মজীদ নানা জায়গায় বর্ণনা করেছে এবং হাদীসে অধিক ব্যাখ্যাসহকারে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহর পথে একবার সকালে অথবা বিকালে যাওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারও পা রাখার জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে কোন রমণী পৃথিবীতে এসে গেলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল উজালা হয়ে যাবে এবং সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যাবে। তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা মূল্যবান।

আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন—

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ

অর্থাৎ, এই রমণীগণ যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ।

আয়াতের তাফসীরে তিনি এরশাদ করেন— পর্দার অন্তরালে তাদের মুখাকৃতি আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখা যাবে। তাদের অলংকারের সামান্য

মোতিও পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে দেবে। তাদের দেহে সত্তরটি কাপড় এমন থাকবে যে, মানুষের দৃষ্টি সেগুলো পার হয়ে যাবে। তাদের গোছার মগয অস্থির ভিতরে দৃষ্টিগোচর হবে।

হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—মে'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতের ইয়াবযখ নামক এক জায়গায় গেলাম। সেখানে মোতি, সবুজ পান্না ও লাল পদ্মরাগ মণির তাঁবু ছিল। তাঁবুর রমণীরা আমাকে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ' বললে আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম ঃ এই কণ্ঠস্বর কোন্ রমণীদের? তিনি বললেন ঃ এই রমণীগণ তাঁবুর মধ্যে পর্দানশীন। তারা পরওয়ারদেগারের কাছে আপনাকে সালাম করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ

অর্থাৎ, সুলোচনা ও তাঁবুতে অবস্থানকারিণী রমণীগণ।

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (পবিত্র স্ত্রীগণ) আয়াতাংশের তাফসীরে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ পবিত্র হওয়ার অর্থ তারা হায়েয, প্রস্রাব-পায়খান, থুথু, বীর্য, প্রসব ইত্যাদি থেকে পবিত্র হবে।

আবদুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির অধীনে এক হাজার খেদমতগার থাকবে। প্রত্যেক খেদমতগার এমন কাজ করবে, যা অন্যে করবে না। হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, জান্নাতে সুলোচনা রমণীগণ গান গায় এবং বলে— আমরা অপরূপা সুন্দরী রমণী। ভদ্রলোকদের জন্যে আমাদেরকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ

অর্থাৎ, তারা বাগানে সম্বর্ধিত হবে।

আয়াতাংশের তাফসীরে ইয়াহইয়া ইবনে কাছির বলেন ঃ জান্নাতে রাগ ও সঙ্গীত থাকবে।

আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতী ব্যক্তির শিয়র ও পায়ের কাছে বসে দু'জন হূর অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে গীত শুনায়। মানুষ ও জিন উৎসাহভরে এই গীত শুনে।

আল্লাহ তা'আলার রহমত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) শুভ লক্ষণ পছন্দ করতেন। মাগফেরাত আশা করার মত নেক আমল আমাদের নেই বিধায় আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর অনুকরণে শুভ লক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আশা করছি, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের পরিণাম শুভ করবেন। সেমতে আমরা এই গ্রন্থটি রহমতের আলোচনা দ্বারা সমাপ্ত করছি।

রসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলার একশ'টি রহমত থেকে মাত্র একটি রহমত পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে নাযিল করেছেন। এ থেকেই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী পরস্পর দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। তিনি নিরানব্বইটি রহমত পেছনে রেখেছেন। সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন বান্দাদের প্রতি রহমত করবেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচ থেকে একটি লিখিত কাগজ বের করবেন। তাতে লেখা থাকবে— আমার রহমত আমার গযবের উপর প্রবল। আমি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিকতর মেহেরবান। এরপর দোযখ থেকে জান্নাতীদের দ্বিগুণ সংখ্যক লোক বের হয়ে যাবে।

এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেন— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান হবেন এবং বলবেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে একজন করে ইহুদী ও খৃস্টানকে দোযখে নিক্ষেপ করেছি।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— যখন দোযখীরা দোযখে একত্রিত হবে এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুসংখ্যক মুসলমানও থাকবে, তখন কাফেররা মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করবে— তোমরা কি দুনিয়াতে মুসলমান ছিলে না? তারা জওয়াব দিবে, হাঁ, ছিলাম। কাফেররা বলবে— তাহলে তোমাদের ইসলাম তোমাদের জন্যে উপকারী হল না কেন? আজ তোমরা ও তো আমাদের সাথে দোযখে রয়েছ। মুসলমানরা বলবে— আমরা অনেক গোনাহ করেছিলাম। তাই সাজাপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কথাবার্তা শুনবেন এবং আদেশ করবেন, দোযখে যে সকল মুসলমান রয়েছে, তাদের সকলকে বের করে দাও। অতঃপর আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে বের করে আনা হবে। এটা দেখে কাফেররা বলবে— হায়, আমরাও মুসলমান হলে এমনিভাবে মুক্তি পেতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, প্রায়ই কাফেররা বাসনা করবে, যদি তারা মুসলমান হত!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী জননীর যে অনুকম্পা, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা তার চেয়ে অনেক বেশী।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার সৎকর্ম পাপকর্মের তুলনায় বেশী হবে, সে বে-হিসাব জান্নাতে দাখিল হবে। যার সৎকর্ম ও পাপকর্ম সমান সমান হবে, সে সামান্য হিসাবের পর জান্নাতে দাখিল হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শাফায়াত সে ব্যক্তির জন্যে, যার পিঠ পাপকর্মের বোঝায় অত্যধিক ভারী হবে।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— কিয়ামতের দিন আরশের নীচ থেকে ঘোষণা করা হবে— হে উম্মতে মুহাম্মাদী, আমার যে হক তোমাদের যিম্মায় ছিল, তা আমি মাফ করে দিলাম। এখন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল হক রয়েছে, সেগুলো তোমরা একে অপরকে মাফ করে দাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার অপার ও অসীম রহমতের সুসংবাদ দেয়। সেমতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সাথে সেই আচরণ না করেন, যার আমরা যোগ্য এবং তাঁর কৃপা, দান, অনুগ্রহ ও রহমতের আচরণই যেন আমাদের নসীব হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَّ اٰخِرًا -